এই পৃথিবী রঙ্গালয়

তৃপ্তি মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯/ডিসেম্বর ১৯৭২

প্রচ্ছদপট-অংকন

খালেদ চৌধুরী

মুদ্রণ

ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন
স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

বাবা আশুতোষ ভাদুড়ী এবং
মা শৈলবালা দেবীর
স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে প্রথম সারির অভিনেত্রী বলেই জানতাম, বিশেষ করে তাঁর 'অপরাজিতা' দেখে তাঁকে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠতমা বলেই মনে হয়েছে।

কিন্তু তিনি যে লেখিকাও—তা অত লক্ষ্য করিনি। হঠাৎই তাঁর এই গল্প-সংকলনটি হাতে এসে পড়ল। এক রকম চমকে উঠলামই বলা উচিত।

না, গল্পের গঠন বা বিবৃতি এমন কিছু অসাধারণ নয়—এটা হয়তো লেখিকা নিজেও স্বীকার করবেন। তাঁর কৃতিত্ব অন্যত্র। ও'র আপাত-সাধারণ কাহিনী-গুলির মধ্যে ভাষার বাইরেও কিছু বক্তব্য থাকে। কিছু বেদনা, কিছু ব্যর্থতা, —অথবা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। অর্থাৎ ভাষায় বলা যখন শেষ হয়ে যায়, তখনও বক্তব্যর শেষ হয় না।

এই প্রথম গল্পটিই ধরুন। বাল্যকালের সখী, যাকে লেখিকা 'কালো হরিণ চোখ' আখ্যা দিয়েছেন, সে ছিল দরিদ্রের মেয়ে। কোন মতে তার বিয়ে হল, মেয়ের ঘোর অনিচ্ছাসত্বেও—কারণ মেয়েটির সাধ ছিল লেখাপড়া করার, কিন্তু বাবা-মায়ের সে সঙ্গতি ছিল না—কোন মতে পরের ঘরে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর দেখা গেল ওকে শুধু তারা খাটাবার জন্যেই নিয়ে গেছে। স্বামী অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত—অর্থাৎ দুর্দশার শেষ নেই।

অন্য দিকে কাহিনীর নায়িকা, উচ্চশিক্ষিতা, সুবিবাহিতা, সুখী হবার সমস্ত আয়োজনই ছিল জীবনে—কিন্তু তিনি সে প্রাচুর্যের সুখী জীবন ত্যাগ করে দেশের কাজে নেমে পড়লেন, গ্রামে শহরে সর্বত্র নিজের রাজনৈতিক মত প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হ্যাঁ, নেত্রী বলে সবাই মান্য করে, নামটা কানে গেলেই উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টিতে লোকে চেয়ে থাকে—কিন্তু দীর্ঘকালের এই কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি কোন্ সাফল্যে এসে পৌঁছতে পারলেন?—এ প্রশ্ন কি তাঁর মনে জাগে না, ফেলে আসা স্বামী, হলে হতে পারত সন্তানদের কথা?

এইভাবে কাজ করতে করতে হঠাৎই একদিন লোক্যাল ট্রেনের কামরায় বহু সন্তানের জননী এক ক্লান্ত স্ত্রীলোককে দেখলেন, সঙ্গে তার স্বামী। দেখতে দেখতে নেত্রীর মনে হল—এ কি সেই 'কালো হরিণ চোখ'? কতকটা সেই রকম দেখতে, তবে সে প্রথম বয়সের মেয়েটিকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন বৈকি।

মনে হল, আজ যদি সে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হত—তার কথা তার সংসারের কথা জানতুম, নিজের কথাও বলতে পারতুম—একটু শান্তি পাওয়া যেত অন্তত।

মাঝামাঝি একটি স্টেশনে স্বামীর তাড়ায় ছেলেমেয়েদের গুছিয়ে নিয়ে সেই অকালবৃদ্ধ মহিলা যখন নামছেন তখন নিশ্চিত হলেন নায়িকা—এই সেই 'কালো হরিণ চোখ'।

ডাকা গেল না, বলা হল না যে আমি এখনও বেঁচে আছি। জানা হল না তার কথা।

গল্প এইখানেই শেষ—কিন্তু সত্যিই কি শেষ হল? এর মধ্যে কি পাঠক-পাঠিকা কি এই আপাত-সার্থক জননেত্রীর ব্যর্থতার বেদনা, এবং ঐ দরিদ্র হত-ভাগিনী মেয়েটার এক ধরনের সার্থকতার জয়লাভ খুঁজে পান না! এইখানেই লেখিকাব বিশেষত্ব, তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়।

যে গল্পটি নিয়ে এই আলোচনা, সেটিই এই গ্রন্থেব প্রথম গল্প—'কী যেন স্টেশনটার নাম'। প্রথম গল্প নিয়ে যে এত আলোচনা করলুম, তার কারণ, এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পের ধর্ম প্রথম গল্পের অনুরূপ। এই সব গল্পের মধ্যেই লেখিকার সৃষ্টিমানস বিশেষভাবে ধরা পড়েছে।

ঠিক প্রথম গল্পের মতই, পাঠকের মনকে নিবন্তর প্রশ্নে আন্দোলিত করে গল্প শেষ হয়ে যাবার পরেও—দ্বিতীয় গল্পটি। একটি স্বামী-পবিত্যক্তা তরুণী এল পুরীতে। বোধ হয় মানসিক বিপর্যয়ের ভার লাঘব করতে। পূর্বপবিচয় না জেনেই একটি তরুণ এগিযে এসে আলাপ করল। ভয় ভাঙিযে সমুদ্রে স্নান করতে শেখাল। পরিচয় পাবার পরেও সে তরুণীটিব মধ্যে এমন কিছু গুণ বা আকর্ষণ দেখল যা তার বাগ্দত্তা বধূর স্বভাবে অনুপস্থিত। একদিনের জন্য তরুণটি কোনারকে বেড়াতে গেল। অদর্শনের মধ্যে সেই ডিভোর্সী মেযেটির প্রতি আকর্ষণ তীব্রতর হল। প্রেম ঠিক নয়, তবুও কিছু একটা সহানুভূতির কথা বলার জন্য সে প্রায় ছুটেই ফিরল পুরীতে। এসে দেখল স্নান করতে গিয়ে তরুণীটি সমুদ্রে ডুবে গিয়ে মারা গেছে। তখন তার না-বলা কথা ও তরুণীটির সমুদ্র-স্নান-ভয় ভাঙানোর জন্য অনুতাপ তার তরুণ-হৃদয়কে কুরে কুরে চিরতে থাকে। বলা বাহুল্য, গল্প শেষ করার পর পাঠকের মনকেও।

'বদল' গল্পটি রঙ্গমঞ্চের এক নায়কের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। লেখিকা এ গল্পে নিজের পরিচিত পটভূমিতে বিচরণ করেছেন, স্বচ্ছন্দ গতিতে। কিন্তু তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীটি এখানেও ভালভাবেই চোখে পড়ে। পুরনো গন্ধ, ঝাপসা

আলোয় প্রভৃতি গল্পের আবেদন একই ধরণের।

এই গ্রন্থের দুটি গল্পকে আমার খানিকটা ভিন্নধর্মী বলে মনে হয়েছে। একটি হল—'একটা বেড়াল একটা লোক' গল্পে নায়কের সঙ্গে প্রায়সমপর্যায়ে উঠে এসেছে পোষা বেড়ালটির চরিত্র। আর একটি, গ্রন্থের শেষ গল্প 'দুঃস্বপ্ন' এটি রূপক-ধর্মী রচনা। হয়তো কিছুটা abstract। বর্তমান কালের সমস্যাকে ভিত্তি করে এমন ঘনসম্বদ্ধ নাটকীয়তার আবেশ সৃষ্টি হয়েছে, মনে হয় চোখের সামনে কোন গ্রীক নাটক অভিনীত হচ্ছে।

এই সব গল্প পড়তে গিয়ে যদি কেউ এদের মধ্যে প্রথাসিদ্ধ conventional ছোটগল্পের চরিত্র খোঁজেন তিনি কিন্তু গ্রন্থপাঠের সামগ্রিক রসোপভোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। বরং পাঠক যদি মনে রাখেন—এই গল্পগুলির লেখিকা হলেন একালের এক প্রথম শ্রেণীর অভিনয়-শিল্পী, যিনি বহুচরিত্রকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করে অগণিত দর্শককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তিনি এক বাড়তি রস পাবেন। দেখবেন, একের পর এক নানা চরিত্র অবতীর্ণ হচ্ছে তাঁর সামনে। যেমন বিচিত্র তাদের ভূমিকা তেমনই বৈচিত্র্যময় তাদের পরিণতি। বস্তুত এইখানেই গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা।

লেখিকার গল্প-রচনার বৈশিষ্ট্যর কথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের মতে সেটাই ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি, তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘন-ঘটা নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।

অভিনয়-জগতের একজন সার্থক শিল্পীকে স্বগোত্রে স্বদলে পেলে কার না আনন্দ হয়। স্নেহাস্পদা শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে গল্প-লেখিকা রূপে দেখা ও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লেখা আমার কাছে তাই দ্বিবিধ আনন্দদায়ক।

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ সূচী ॥

এই পৃথিবী

রঙ্গালয়

কী যেন স্টেশনটার নাম
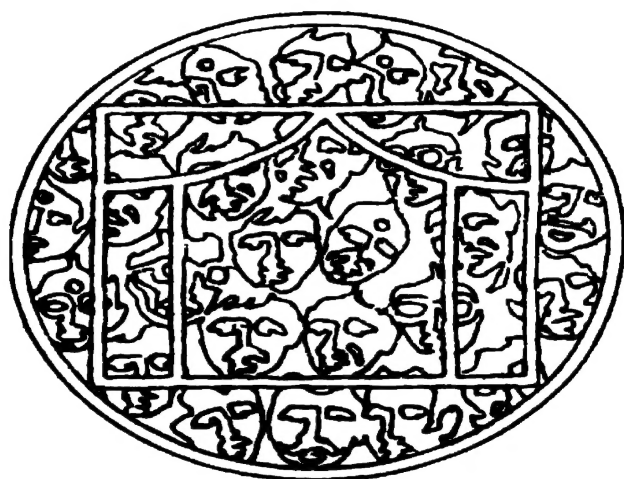
শিয়ালদহ স্টেশন দিয়েই তাহলে যেতে হবে। আর কিছুদিন আগে হলে শিপ্রা চৌধুরী—'ওঃ না, আমি এখন আবার গুপ্ত' মনে মনে ভাবলেন শিপ্রা। আর কিছুদিন আগে হলে শিপ্রা লোকাল ট্রেনে চেপে কল্যাণী যাবার কথা ভাবতেও পারতেন না। গাড়ি—যে কোন নিজের বা আর কারো গাড়িতে কল্যাণী যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নিজের গাড়ি নেই এখন। নিজের? নিজের ছিল কখনও? আর পেট্রলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধব পার্টি সহযোগী কাউকেই আর অমন চট করে বলা যায় না যে, 'শোন আমি অমুক জায়গায় যাব তোমার গাড়িটা চাই।' কী যে দিনকে দিন হয়ে গেল! বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল শিপ্রা চৌধুরীর। আর তাছাড়া পার্টির নির্দেশও এই যে, কোথাও যেতে গেলেই ওরকম গাড়ির বায়না যদি সকলেই করে—তাহলে তো···! অর্থাৎ আপনি আচরি ধর্ম শিখাও পরেরে। মুস্কিল হচ্ছে যে, একটা মিটিং-এ শিপ্রা নিজেই এই কথা বলেছিলেন। তবে এ, ও, সে এদিক ওদিক সেদিক যায়ই—তাই প্রায়ই একটা না একটা লিফট জুটেই যায়। কিন্তু আজ কপাল খারাপ। শেষ মুহূর্তে ডাঃ বাগচীর গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। অথচ কাল রবিবার সকালেই ওখানে মহিলা কর্মীদের নিয়ে একটা মিটিং হবার কথা। তাই গাড়ির জন্যে বসে থাকলে তো চলবে না। হয়তো ডাঃ বাগচীর গাড়ি কাল সকালে ঠিক হয়ে যেত। মনের খুব নিভৃত কোণে শিপ্রা জানেন যে তাঁকে পাশে নিয়ে গাড়ি চালাতে ডাঃ বাগচী পছন্দ করেন। হয়তো একটু বেশীই পছন্দ করেন—তাই কাল সকালে—। কিন্তু না, শিপ্রা আজ পর্যন্ত কোন ব্যাপারে

নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট পরে পেঁাছেছেন এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। তাই শিয়ালদহ স্টেশনে এই অভিযান।

পার্টির দুই অল্পবয়সী সভ্য মণ্টু আর অজুও সঙ্গে আছে। যত প্রগতিবাদীই হোন না কেন শিপ্রা—এখনও স্টেশনে এসে, লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে, ভিড় ঠেলে একলা ট্রেনে উঠতে পারেন না। একটু কেমন কেমন লাগে যেন। দু'একবার এমন হয়েছে যে দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছে। তখন মণ্টু অজু অথবা আলী—বা পার্টির যে কোন দুজন সভ্য তাঁর দুপাশে গার্ডের মত দাঁড়িয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে গন্তব্যস্থলে। ওরা ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শিপ্রা একটু স্বস্তি পান। আর বয়সও তো কম হল না। আসছে মে মাসে আটচল্লিশ হবে। কেউ বিশ্বাস করবে? এই তো ঘেমে নেয়ে একটা জরুরী মিটিং শেষ করে সবে চা খাবার ফেলে চলে এলেন। বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে জল পর্যন্ত দিলেন না। তবু কেউ বলবে যে তাঁর বয়স চৌত্রিশের বেশী হতে পারে? একটা গর্ব অনুভব করেন শিপ্রা মনে মনে। কত মেয়ে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি কি যোগ অভ্যাস করেন শিপ্রাদি' বা 'বড়দি'? পার্টিতে বড়দি বলে ডাকটাও কেমন করে না জানি এক সময় চালু হয়েছিল। শিপ্রা জবাব দেন, 'নাঃ ভাই, সময় কোথায়?' কিন্তু এক এক সময় স্পষ্ট বুঝতে পারেন—দু' একজন সন্দিগ্ধ, বিশ্বাস করছে না। কেমন অদ্ভুতভাবে যেন তারা তাকিয়ে থাকে। এই তো সেদিন পার্টি অফিসের বাথরুমের পার্টিশনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন থমকে নিজের নাম কানে যেতেই। দুটি মেয়ে কথা বলছে। মেয়ে না বলে অবশ্য মহিলা বলাই ভাল। বয়স বত্রিশ-চৌত্রিশের কম নয়। বলে অবশ্য আঠাশ-উনত্রিশ। শিপ্রা জানেন ওদের আঠাশ-উনত্রিশ এখনও অন্ততঃ বছর চারেক ধরে চলবে। উষা বলছিল, 'আরে যোগ ফোগ না করুক, একসারসাইজ ফেক্‌সারসাইজ করে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের শেখাবে না পাছে ওর কমপিটিটর হয়ে যাই।' লেখা বললে—'উনি ছাড়া আর লোক নেই নাকি? আমরা শিখতে চাইলে কেমন করে ঠেকান উনি দেখব।'

না, শিপ্রা বয়স কমান না। এজন্য ভুগতেও হয়েছে তাঁকে অনেকবার। মনে পড়ছে বাইশ বছর বয়সে ঠিক বয়স বলবার জন্য এক পাত্র ফসকে গিয়েছিল। পাত্রের বয়স ছাব্বিশ। তারা চেয়েছিল পাত্রীর বয়স যেন কিছুতেই কুড়ির বেশী না হয়। দু বছর কমিয়ে বললে কিছুই এসে যেত না। কিন্তু শিপ্রা জিদ ধরলেন—না, ঠিক বয়সই বলতে হবে। জ্যাঠামশায়ও সায় দিলেন। বললেন,

'হ্যাঁ, ওসব করে কী হবে ? আর দু'দিন পর তারা সত্যি বয়স জানতে পারলে ভাববে কী ?' এই নিয়ে বিধবা মা আর চিরকুমারী পিসিমার সঙ্গে কি মনোমালিন্য। পিসিমার ভয় ছিল তাঁর মত শিপ্রাকেও না বাধ্যতামূলক চিরকুমারীর ব্রত গ্রহণ করতে হয়। হয়নি, তার এক দেড় বছরের মধ্যে রাজনীতিতে প্রবেশ। তৎকালীন সেই পার্টির মেজদাদা গোছের নেতা প্রসেন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ, প্রেম এবং বিবাহ। তারপর আর কোনোদিকে তাকাবার অবসর নেই। প্রসেনরা বড়লোক। তাই অন্য কোন কাজ ছিল না, ছিল না দারিদ্র্যের দুর্ভাবনা। তাই কেবল প্রেম করা আর রাজনীতি করার মধ্যে দিয়ে যে কতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছিল !

ঘড়ি দেখলেন শিপ্রা। ট্রেন ছাড়বার সময় তো পার হয়ে গেছে, তবু ছাড়ছে না কেন ট্রেন ? ওঃ, কি গরম ! ওপরদিকে চাইলেন শিপ্রা। নাঃ, একটাও পাখা নেই। কেবল মস্ত বড় দুটো কালো গর্ত। কী যে সব খেলা চলছিল কয়েক বছর ! জাতীয় সম্পত্তির বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে বজ্জাতের দল। জাতটা বদই বটে ! এত যে মিটিং করে করে বেড়াচ্ছি, এত যে মেয়েগুলোকে বোঝাচ্ছি যে এত ছেলেপুলে কোর না, দেশটা তাহলে রসাতলে যাবে। তা কোন খেয়াল আছে ? সাতছেলের মাকেও বিশ্বাস করানো কী শক্ত ! এক-একটা মেয়ে আবার এমনভাবে হেসে মুখে আঁচল চাপা দেয় যেন শিপ্রা চৌধুরী ওদের ইয়ার। ইচ্ছে করে ঠাস করে এক চড় মারতে। কিন্তু না, রাজনীতি করতে গেলে অনেক কিছু হজম করে মুখভাব সদাপ্রসন্ন রাখতেই হয়। হঠাৎ ট্রেনের আলোগুলো ঝপ করে নিভে যায়, শিপ্রা বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু অন্য যাত্রীরা নির্বিকার। যা হবে একটু পরেই তো জানা যাবে। হয় আলো জ্বলে উঠবে, ট্রেনটা চলবে—নয় একটা ঘোষণা বা তাও নয়, কারা যেন কেমন করে খবর পেয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে রব উঠবে 'আরে এটা যাবে না—এটা যাবে না', 'শিগগীর চল শান্তিপুর এখুনি ছেড়ে যাবে', 'পরের ট্রেন রাত দশটায়' ইত্যাদি টুকরো কথার চীৎকার। দৌড়োদৌড়ি। কিন্তু যদি এটা ছাড়ে ? এই ভীড়ের ট্রেনে জায়গা ছেড়ে খবর নিতে যাওয়া কোন কাজের কথাই নয়। তাই যাত্রীরা বসে থেকে যেমন কথা বলছিল তেমনিই বলতে থাকে। কথা, কেবল কথা। এত কথাও বলতে পারে সবাই ! আর রসিকতা ? উঃ, কি ভালগার ! অশ্লীল ? না, সব সময় হয়তো অশ্লীল নয়। কিন্তু কী বোকার

মত রসিকতা করতে পারে এরা!

শিপ্রা অস্থির হলেন মনে মনে।

—'এই মণ্টু, এ ট্রেনটা যাবে না?'

মন্টু বলল,—'ঘাবড়াবেন না বড়দি, আমরা তো আছি।'

উঃ, বলার ভঙ্গী কি! যেন ওরা আছে বলেই ভয় পেয়ে ট্রেনটা এখুনি দৌড়োতে শুরু করবে!

'না, ভাবছি দেরি হয়ে যাবে বড্ড—'

অজু বললে—'কিছু ঘাবড়াবেন না, ট্রাংক করে তো আপনার যাবার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পার্টি আপিসে—নিশ্চয়ই সনৎ মুখুজ্জের বাড়িতে আপনার থাকার ব্যবস্থা হবে—আর আপনি না যাওয়া পর্যন্ত ওরা খেয়ে শুতে পারবে নাকি শিপ্রাদি!'

যেন যাবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন শিপ্রা। ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ, কতবার বলেছি না তোমাদের ভীড়ের মধ্যে পার্টির কাজে যাচ্ছি বা ঐ ধরনের কোন কথা বলবে না? আর 'বড়দি' বলবে, 'শিপ্রাদি' বলবে না?'

শিপ্রার বড় ভয় এই ভীড়ের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনে ফেলবে আর তাহলেই উনি বড় মুস্কিলে পড়ে যাবেন। শিপ্রা জানেন 'শিপ্রাদি' 'শিপ্রাদি' বলে চেঁচালেই কোন কৌতুহলী লোক যদি খুঁটিয়ে দেখে তাহলেই বুঝতে পারবে ইনি আর কেউ নন, সেই বিখ্যাত নেত্রী শিপ্রা চৌধুরী। ব্যস, আমড়াগাছি শুরু হয়ে যাবে! যদিও শিপ্রা জানেন যে জনসাধারণ নিয়েই তাঁদের কারবার তাই এ ধরনের মনোভাব অচল একেবারে অচল, তবু মাঝে মাঝে বড় ক্লান্ত লাগে তাঁর এই রকম একটা জায়গায় যে কোন লোকের যে কোন সমস্যা সংকুলিত প্রশ্নের উত্তর দিতে। তাছাড়া এখনও কোথায় যেন একটা লাগে। যে শিপ্রা গাড়ি ছাড়া চলতেনই না বিয়ের পর, গাড়ি না থাকা অবস্থাটা যাঁর প্রায় মনেই ছিল না, তাঁকে হঠাৎ চেনা বা অচেনা কেউ ভীড়ের মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলুক এ তিনি চান না, এ ধরনের ভাবনা অন্যায়। এতে একটা দীনতা প্রকাশ পায়, বোঝেন শিপ্রা, কিন্তু না ভেবেও পারেন না। প্রসেন চৌধুরীর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তিকে এত বেশী নিজের বলে ভেবে ফেলেছিলেন, এ পৃথিবীতে কিছুই যে স্থায়ী নয়, ডিভোর্সের মামলা চলাকালীন মর্মান্তিকভাবে সেটা বুঝলেন শিপ্রা গুপ্ত। একদিকে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার কল্পনা, অন্যদিকে ট্রামে বাসে চলবার আতঙ্কিত কল্পনায় বেসামাল হয়ে উঠতেন তিনি। তবে তিনি কি দুঃখিত? না, সমস্ত

ঢুকে গিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন তিনি। ভগবানকে ধন্যবাদ সেজন্য। আচ্ছা ভগবান কি মানেন তিনি? উঃ কি অসহ্য গরম! 'হায় ভগবান, কতক্ষণ যে এই গরমে সেদ্ধ হতে হবে!' কথাটা মনে আসতেই, মনে মনেই হেসে ফেললেন শিপ্রা চৌধুরী।

'এ গাড়ি যাবে না, এ গাড়ি যাবে না', চীৎকারে চমকে উঠলেন শিপ্রা। সেই ছোট কামরার ভিড় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। 'বার্ণপুর এখনো যায়নি, দৌড়ে গেলে এখনো ধরা যাবে'—নানা কথা আর ধাক্কাধাক্কির মধ্যে মণ্টুর গলা, 'বড়দি, তাড়াতাড়ি আসুন, তাড়াতাড়ি নামুন।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে প্রচণ্ড টান। 'আঃ মণ্টু, কী হচ্ছে কী, হাত ছাড়. বয়স হচ্ছে অত তাড়াতাড়ি নামতে পারব না!' অজান্তে আবার সেই পরম সহিষ্ণু ভগবানের ওপরই রাগ করে বসলেন শিপ্রা। চলার তোড়ে মণ্টুর মুখের তোড়ে কোন বাধা পড়ে না, 'আপনার বয়স হয়েছে, কি যে বলেন বড়দি! সেদিন রাজাদা কি বলেছিলেন জানেন? বলছিলেন, শিপ্রাকে কনে সাজিয়ে আর একবার বিয়ে দেওয়া যায়।' 'আঃ মণ্টু, একশোবার বলেছি রাস্তাঘাটে ও নাম মুখে আনবে না!' চাপা স্বরে যেন গর্জন করে ওঠেন শিপ্রা।

যদিও এসময় কারুর দিকে কারুর নজর দেবার সময় নেই। কথায়ও কান দেবার সময় নেই। তবু সাবধানের মার নেই। এই তো সেদিন হাওড়া বর্ধমান লাইনে অরূপ 'শিপ্রাদি, শিপ্রাদি' বলে চেঁচানতে কী মুস্কিলেই পড়তে হয়েছিল। একটা মেয়ে সোজা এসে বলল, 'আপনিই কি বিখ্যাত নেত্রী শিপ্রা চৌধুরী?'

স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরির আবদার।

—'আপনি আমার নিজের দিদির মত, আমাকে আপনার একটা চাকরি করে দিতেই হবে শিপ্রাদি।'

বোঝে না যে ইচ্ছে থাকলেও তিনি চাকরি করে দিতে পারেন না। আরও জ্বালা হয়েছে মহিলাবর্ষ হয়ে। এত ছবি বেরিয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায় শিপ্রা চৌধুরীর। হ্যাঁ, কাগজে কলমে এখনও চৌধুরীই চালাতে হয়। চৌধুরী নামেই তার জনসমক্ষে পরিচিতি। আজ উল্টে দিলে ওদের মধ্যে কাজ করতে পারবেন কেন? তাই আইনত আবার গুপ্ততে পরিণত হলেও গুপ্তকে লুপ্ত করেই রাখতে হয়। বেআইনি চৌধুরীই জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ ব্যাপারটা অসম্ভব অপছন্দ করেন। কিন্তু উপায় কী?

সব ব্যাপার চুকে যাবার পর যখন তিনি আবার গল্প লিখতে চেয়েছিলেন, অম্বুজদার মত নেতাও তো বললেন, 'কী দরকার সাধারণের মধ্যে একটা কনফিউশন সৃষ্টি করে ? এই কাজ কি তুমি ছাড়তে পারবে ? তোমার জীবনের মিশন ?'

না, না, না, আর সব ছাড়তে পারেন শিপ্রা, সবই ছেড়েছেন, কিন্তু এই কাজ, এই নেত্রীপদ, ছোটদের এই বড়দি সম্বোধন আর প্রণাম, এ তিনি ছাড়তে পারবেন না। সকলেই জানে শিপ্রা চৌধুরী স্বার্থহীনভাবে কাজ করেন। তাই আজ দলের ছোট বড় সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে—এ তিনি ছাড়তে পারেন কি ? তাই স্বামী বাড়ি গাড়ি ঝি চাকর—অনেক আরামের অভ্যাস তিনি ছেড়েছেন, কিন্তু চৌধুরী পদবীটাকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

নাঃ অসম্ভব, অসম্ভব ভিড়। কোন কামরাতেই ওঠা যাচ্ছে না। মনে মনে অসম্ভব চটে গেলেন শিপ্রা ডাঃ বাগচীর ওপর। আজই গাড়িটা খারাপ করার কী দরকার ছিল ওঁর ? আবারও মনে মনে হেসে ফেললেন শিপ্রা। এরকম ভাবনার কোন অর্থ হয় ? আসলে তিনি বড় বেশী আশা করেছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কর্মক্লান্ত দেহটাকে কোনোও মতে গাড়ীর সিট-এ ফেলে দিয়ে ঝিমোতে ঝিমোতেই পেঁাছে যাবেন কল্যাণী। কিন্তু হায়! ছুটতে সত্যি তাঁর এবার বেশ কষ্ট হচ্ছে। হাঁটুর হাড়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। অজু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে—'মণ্টু, এদিকে জায়গা পাওয়া যাবে না, একেবারে সামনের দিকের কামরায় যেতে হবে। ওখানে এখনও জায়গা আছে।'

এবার সত্যি দৌড়তে হচ্ছে। ছোটবেলায় দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অনেক কাপ মেডেল পেয়েছেন তিনি। এখনও মন্দ দৌড়তে পারেন না, কিন্তু মানুষ ঠেলে দৌড়বার অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই যে! তবু একসময় দুঃখের দিনের অবসান হয়। একেবারে সামনের দিকের একটা কামরায় খানিকটা অনায়াসেই উঠে পড়ে তিনজনে। ভিড় এখানেও। তবে অপেক্ষাকৃত কম। মণ্টু, অজু দুজনেই বিব্রত হয়ে বলে, 'মনে হচ্ছে দাঁড়িয়েই যেতে হবে আপনাকে বড়দি।'

'তাতে কী! সব কিছুর জন্যেই তো আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে!' অভ্যস্ত হাসি মুখে টেনে এনে বলেন শিপ্রা।

'ঐ তো সামনের ঐ বড় সিটটার মাঝখানে একটু জায়গা আছে বড়দি।

আপনার হয়ে যাবে।' মণ্টু বলে ওঠে।

'কিন্তু তোমরা?' ভদ্রতা করে বলেন শিপ্রা। কিন্তু জায়গাটুকু দেখে তাঁর সমস্ত শরীর একটু বসবার জন্যে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

'আপনি তো আগে বসুন বড়দি।'

শিপ্রা দেওয়াল ঘেঁষে একোণ থেকে ওকোণ লম্বা বেঞ্চিটার দিকে এগিয়ে যান। এক ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'সাবধান, সাবধান। জায়গাটা কি ওমনি খালি পড়ে আছে মনে করেছেন? পায়ের কাছে মেঝেতে কি যেন পড়ে আছে তাই কেউ বসেনি। নাহলে এতক্ষণে—!'

'বমি-টমি করেছে নাকি কেউ?' আর একজন বললে। শিপ্রা শিউরে ওঠেন। একজন খুব নিরীক্ষণ করে বললে, 'না না, স্কোয়াশ টোয়াশ জাতীয় কি একটা পড়েছে বোধহয়। আসেন বসেন তবে কাপড়টা একটু সাবধান কইরা বসবেন।'

পায়ের কাছে কাপড়টা গুটিয়ে সাবধানে বসে পড়েন শিপ্রা। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন এই বসবার জায়গাটুকুর কত দরকার ছিল তাঁর।

ট্রেন চলে। কত লোকের কত কথা! মাথাটা হেলিয়ে ট্রেনের দেয়ালে রাখতে ইচ্ছে করে। নাঃ, ধেৎ, এরকম অসভ্যের মত বসতে পারেন নাকি তিনি! শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকেন শিপ্রা চৌধুরী। হঠাৎ নজর পড়ে সামনের আসনের দিকে। এক প্রৌঢ়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রথমেই চমকে মনে হোল, চিনতে পেরেছে নাকি? না, মহিলার মুখের ভাব অন্যরকম, কেমন যেন মুগ্ধতা। অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন শিপ্রা। মুখ ফিরিয়ে নেন। জানলার ধারের আসন নয় যে জানলার দিকে মুখ রেখে মহিলাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করবেন। তাই উর্ধমুখী হয়ে ছিন্ন পাখার গর্তের দিকে মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখতে থাকেন। মহিলার বাঁদিকে জানলা ঘেঁষে বসেছিল তিন-চারটি ছেলে মেয়ে, তারা নিজেদের মধ্যে বক বক করে চলেই ছিল। সবচেয়ে বড় মেয়েটি বললে, 'এরপর কোন্ ইস্টিশন আসব ক দেখি?'

'ব্যারাকপুর।' বললে সবচেয়ে ছোটটি।

'বোগদা কোথাকার!' বড় তিনজনের কী হাসি।

'তবে ইছাপুর।' বললে ছোটটি।

সবাই আরও জোরে হেসে উঠল। চোখ নামালেন শিপ্রা। এত হাসিতে না তাকিয়ে পারা গেল না। কি রোগা! কি রোগা বাচ্চাগুলো মাগো!

এই বয়সে এত বাচ্চা! এদের বড়ও খান-দুতিন আছে নিশ্চয়ই। লজ্জাও করে না এদের! মহিলার বাঁদিকে তার স্বামী—স্বামীই নিশ্চয়। বসে আছে নির্বিকার। ভর্ৎসনার চোখে তাকালেন শিপ্রা তাদের দিকে। মহিলা ঠিক তেমনি ভাবেই তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুখে কি একটু মৃদু হাসি? এই রে! এখুনি নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে বলবে—'আপনিই তো শিপ্রা চৌধুরী? দয়া করে একটা উপকার যদি করেন! এতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে'—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং বলার ভঙ্গীতে থাকবে পূর্ববঙ্গীয় সুর। বাচ্চাগুলোর কথার ঢংএই তিনি তা বুঝতে পেরেছেন। অজান্তেই মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে পাশের লোকদের মাথা ডিঙিয়ে বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন তিনি। বাইরেটা অন্ধকার। চোখের সামনে ভাসতে লাগল মহিলার বড় বড় ভাসা ভাসা ক্লান্ত কিন্তু উজ্জ্বল চোখ দুটো। আর তার পাশে বসা ক্লান্ত প্রায়-বৃদ্ধ ঢুলে পড়া স্বামীর চেহারা। মহিলার বয়স হয়েছে। তবু তার চোখ দুটো যে যৌবনে কত সুন্দর ছিল তার সাক্ষ্য এখনও তার ঐ চোখই দিচ্ছে। মহিলার গায়ের রঙ বেশ কালো। আচ্ছা যৌবনে কি ওকে কেউ বলতো, 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ!' শিপ্রা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওরা কি রবীন্দ্রনাথ পড়েছে? না না, পড়তে পারে নিশ্চয়ই বা শুনেও থাকতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধটি কি ঐ প্রৌঢ়াকে কোনদিন ওরকম একটা কথা বলে থাকতে পারে? শিপ্রা তাকালেন ওদের দিকে। উঃ, আবার সেই চোখ। তারই দিকে মুগ্ধ-ভাবে কী যেন খুঁজছে। খুঁজছে, না কি তাঁর কষ্ট-কল্পনা এটা? শিপ্রা জানেন মহিলার ঐ হাসি দেখে তিনি যদি একটুও হাসির ভাব আনেন মুখে তাহলে আর দেখতে হবে না, নির্ঘাৎ সাহায্যের আবেদন এসে আছড়ে পড়বে। নাঃ, রোমান্টিক হওয়া উচিত নয়। মুখ ফেরালেন তিনি।

আজ থেকে অনেক অনেক দিন আগে একটা মেয়েকে 'কালো হরিণ চোখ' বলে যে ক্ষেপাতেন তাঁরা। ক্লাসের সব মেয়েরা। বেলেঘাটার সেই বালিকা বিদ্যালয়ে যখন পড়তেন। কালো রং-এর ওপর এমনই ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ ছিল তার, চোখের পল্লবও এমনই লম্বা ছিল। এই বয়সে কি এত লম্বা পল্লব থাকে? আবার তাকালেন তিনি প্রৌঢ়ার দিকে। আবারও দেখলেন, সেই দৃষ্টি তাঁরই ওপর ন্যস্ত। কিন্তু মুখে সেই চাপা হাসির ভাব আর নেই, চোখের উজ্জ্বলতা গেছে নিবে। ক্লান্ত গরুর চোখ যেন এখন। শিপ্রা আবার জানলার দিকে তাকালেন।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা স্টেশন পার হয়ে গেছে। তাঁর ডানপাশের ভদ্রলোক নেমে গেছেন। সেখানে মণ্টু বডিগার্ড হয়ে বসেছে। অজু ওৎ পেতে আছে, তাঁর ডানপাশের মহিলা উঠলেই সেখানে সে বসবে। নিশ্চয় বসবে। দরকারে শিপ্রা চৌধুরীকে এরকম ভাবে নিয়ে যেতেই তারা অভ্যস্ত।

শিপ্রা আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন, স্কুলের সেই মেয়েটার নাম কি যেন ছিল? নাঃ, কিছুতেই মনে পড়ছে না। বত্রিশ বছর আগের কথা মনে আনা কি সহজ? তাছাড়া সেই মেয়েটা এমন কিছু ব্রিলিয়াণ্ট ছিল না যে তার কথা এত সহজে মনে পড়বে! এই তো মনে পড়ছে রাধার কথা, যে সেকেণ্ড হত। আর গীতা থার্ড হত। তিনি নিজে অবশ্যই ফাস্ট হতেন। তাছাড়া সেই মেয়েটা বোধহয় ম্যাট্রিকুলেশন দেবার আগেই বিয়েটিয়ে করে স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কি যে নাম ছিল সেই কালো হরিণ চোখ মেয়েটার! নাঃ, নামটা মনে পড়ছে না কিছুতেই। সেই কালো মেয়েটার একটা অন্ধ ভক্তি ছিল শিপ্রার ওপর। বাড়ি থেকে আচার আমসত্ত কতরকম জিনিস এনে যে খাওয়াতো শিপ্রাকে। অনেকেই অবশ্য শিপ্রাকে খাওয়াতো। দু'একজনকে প্রতিদান দেবার কথা মনে হলেও এই মেয়েটাকে কোনদিন কিছু দেবার কথা মনে হয়নি শিপ্রার।

গরীব, খুবই গরীব ছিল ওরা। শিপ্রার অবস্থাও এমন কিছু ভাল ছিল না। বিধবা মা আর ও জ্যাঠামশাই-এর বাড়িতে থাকতো। জেঠিমার মন জুগিয়ে চলতে হত। কিন্তু তবু ওর একটা জোর ছিল। কারণ ও ফার্স্ট হত। স্কুল ফাংশনের অভিনয়ে প্রত্যেকবার বড় পার্ট মিলত আর সেই মেয়েটা ওর হরিণের মত বড় বড় চোখ তুলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে থাকত। হয়তো শিপ্রা রিহার্সেল দিচ্ছে—আর ছুটি হয়ে যাবার পরও মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। কেন? না আচার এনেছিল বাড়ি থেকে, সেটা শিপ্রাকে দেওয়া হয়নি। আর কত অবজ্ঞা-ভরেই না শিপ্রা আচারটুকু নিয়ে টুক করে মুখে ফেলে দিয়ে ঐ কালো হরিণ চোখকে ধন্য করে দিয়েছে। আর এই দেরি হবার জন্যে কত বকুনিই না মেয়েটা খেয়েছে বাড়ি গিয়ে। শুনে শিপ্রা হেসেছে আর বলেছে, 'খা খা বকুনি খা, না হলে মজবুত হবি কি করে?' হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও মনে পড়েছে। মেয়েটার বিয়ের ঠিক হল। তখন ওরা ক্লাস নাইনে পড়ে। কি কান্না ওর! 'ওঃ তোরা কত পড়বি, ম্যাট্রিক দিবি, তারপর আই. এ., বি. এ.। আর আমাকে এখুনি গিয়ে শ্বশুর-বাড়িতে হাঁড়ি ধরতে হবে। সেটা ১৯৪৫ কি ৪৬ সাল। 'চল না শিপ্রা, আমার মাকে একটু বুঝিয়ে বলবি। তোর কথা মাকে অনেক বলি তো? আমার মত

মাও তোকে খুব ভালবাসে, জানিস ?' শিপ্রা গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। অবাক হয়ে দেখেছিল ওদের দারিদ্র্য। এত বেশী গরীব ওরা, ওদের বাড়িতে না এলে বুঝতে পারত না শিপ্রা। খুবই ছোট ছোট দুখানা ঘর। একটা ঘরে একটাই মাত্র খুব ছোট জানলা। রান্না হয় বারান্দায় তোলা উনুনে। অসম্ভব ময়লা বিছানা আর মশারী। ওর ছোট বোন কর্পোরেশন স্কুলে পড়ে। আরও দুতিনটে ছোট ছোট ভাই বোন আছে। কারুর গায়েই জামা নেই। মাথায় তেল নেই। সব মিলিয়ে কেমন যেন লাগছিল শিপ্রার। কি দু'একটা কথার পর ওর মা যখন বললে, 'বল ত মা তুমি অরে বুঝাইয়া, আমাদের মত ঘরে কি অত ল্যাখাপড়া শোভা পায় ? তাছাড়া আমার এমন রং-এর রূপবতী কন্যারে বিনা পয়সায় কে নিত ? এই পাত্র কি হাতছাড়া করা যায় ?'

একটা কথাও বলতে পারেনি তখন শিপ্রা। অনেক পরে ওর মা যখন কড়া-ভাঙা কাপে চা আর রেকাবিতে একটু চিঁড়েভাজা নিয়ে এল, তখন কোনমতে বলেছিল, 'আচ্ছা মাসীমা, ওর শ্বশুরবাড়িতে বলা যায় না বিয়ের পর যদি ওকে পড়ায় তারা ?'

মা বললে, 'নাগো মাইয়া, বলা যায় না। বললেই তারা ভাবব, বাব্বাঃ এ্যাগো বায়না তো কম নয় ! তাহলে বিয়ার পর অরেই ভুগতে হবে। তবে ও নিজে যদি বিয়ার পর বরকে বুঝাইয়া পড়তে পারে পড়বে।'

ক্রন্দনরতা কালো হরিণ চোখকে আশ্বস্ত করে শিপ্রা বলেছিল, 'তুই বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই তোর বর তোকে পড়তে দেবে দেখিস !'

'সে কি আর হয় রে ! কখনও হবে না। কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে, তোদের কারুর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।' ডুকরে কেঁদে উঠেছিল মেয়েটা।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি কি সব সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল।

তারই দু'তিন মাস পর হবে, ছুটির পর ফিরছিল শিপ্রা বাড়ির দিকে। রাধাদের গলিতে রাধা ঢুকে যাবার পর কোথা থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা এক-মাথা সিঁদুর নিয়ে। 'এই শোন !' ডাকল ও।

শিপ্রা চমকে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে তুই কোত্থেকে ? শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে ফিরলি ?'

'এই তো কয়েক দিন, আবার কাল নিয়ে যাবে।'

'ভাল আছিস তো ?' রসিকতা করা উচিত ছিল। কিন্তু শিপ্রার ওসব আসে না। ও হাসল কেমন করে যেন ! আর তখনই শিপ্রা দেখল, রোগা—বড়

রোগা হয়ে গিয়েছে ও।

ও বললে, 'তোর সঙ্গে দু'একটা কথা আছে শুনবি ?'

'বল !'

'চল ঐ মাঠটায় গিয়ে বসি।'

মাঠ মানে ধোপাদের কাপড় শুকোতে দেবার একটা জায়গা। পড়ন্ত রোদ্দুরে দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে দুটো নারকেল গাছ। তারই সামান্য ছায়াতে দুজনে গিয়ে বসেছিল, ও বলেছিল ওর গল্প। আর শুনে শিউরে উঠেছিল শিপ্রা। গল্প এমনিতে সামান্যই। ওর স্বামী ওকে ভালবাসে না। বাসবে না কোনদিন, তার বিধবা সুন্দরী বৌদির সঙ্গেই তার যত সম্পর্ক। ওকে বিয়ে করেছে লোকের মুখ চাপা দেবার জন্যে, তাই বিনা পয়সায় বিয়ে। তাছাড়া একটা কাজকর্মের লোকও তো চাই। সুন্দরী বৌদি আপিসের ভাত দিতে পারে না, পারে না অনেক কিছুই। আর ও সব পারে। সব, সব, সব। এমন কি মার খেয়েও হজম করতে পারে।

'সে কি !' আঁতকে ওঠে শিপ্রা, 'বাড়িতে তোর মাকে বলিসনি ?'

'বলেছি, মা কাঁদে, খালি কাঁদে। বাবা বলল, 'তবু তো ওখানে পেটের ভাত পরনের কাপড় জুটছে, যেমন করে হোক মানিয়ে নিতে হবে। আমি আর বোঝা বাড়াতে পারব না।'

'তাহলে ?'

'দেখলি তো তিন মাসের মধ্যেই আমি কেমন পর হয়ে গেছি ? আমি গেলেই বাবা মা যেন বাঁচে।'

শিপ্রা স্তব্ধ হয়ে রইল।

'চল বেলা পড়ে এল। তোর অনেক দেরি করে দিলাম। জেঠিমার কাছে বকুনি খাবি তো ? শ্বশুরবাড়িতে কেবলই তোর কথা মনে হয়েছে। একথা তো কাউকে বলা যায় না। কিন্তু তোকে বলবার ইচ্ছা হয়েছিল। কেন যে কালো হয়ে জন্মেছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল ওরা। শিপ্রা হঠাৎ ভয় পেয়ে বলল, 'এই তুই, মানে কিছু করার কথা ভাবছিস না তো ?'

কালো হরিণ চোখ যেন জ্বলে উঠল।

'আত্মহত্যা ? কখনই করব না। অপরে করল দোষ, আমি কেন মরতে যাব ? কেবল দেখব মানুষে কতদূর যেতে পারে ! আমি আমার অধিকার

একদিন আদায় করে ছাড়বই।' কী অদ্ভুত জোর এসেছে গলায় মেয়েটার! তিন মাস আগের সেই ভীরু কাঁদো কাঁদো মেয়েটা কোথায় গেল?

'চলি রে। আর হয়তো তোর সঙ্গে দেখা হবে না। বাপের বাড়িতে আর তো আসব না,' শিপ্রার হাতে অল্প চাপ দিয়ে হেসে দ্রুত পিছন ফিরে চলে গিয়েছিল ও।

আচ্ছা সেই কালো মেয়েটার ঠোঁটের ওপর একটা বেশ বড় তিল ছিল না? শিপ্রা তাড়াতাড়ি তাকালেন সামনের মহিলার দিকে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে ঝিমোচ্ছে ও। স্বামীটিও ঢুলছে। ছেলেমেয়েগুলো ক্লান্ত হয়ে চুপ করেছে। সবচেয়ে ছোটটা বড় মেয়েটির কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমুচ্ছে। অনেক লোক নানা স্টেশনে নেমে গেছে, ভিড় অনেক কম।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন শিপ্রা। এখুনি যে দেখা দরকার এ প্রৌঢ়ার ঠোঁটের ওপর একটা বড় তিল আছে কিনা! নাঃ, নিশ্চিন্ত মনে ঢুলছে মহিলা হাঁটুর ভেতর মাথা ঢুকিয়ে। কী নাম, কী নাম ছিল মেয়েটার? কেন, কেন কিছুতেই মনে পড়ছে না? বয়স হলে এরকম হয় বুঝি? দীর্ঘ অতীতের সব কথা মনে পড়ে না? কিন্তু আর সবই তো মনে পড়ল। তবে?

কী একটা স্টেশন আসছে। ট্রেনের গতি মন্থর হল। আরও কিছু লোক হন্তদন্ত হয়ে দরজার কাছে গেল। স্বামী লোকটিও ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

'আরে নাম শীঘ্র। এই শিপ্রা, নাম না তোরা আগে।' লোকটি বলে ওঠে।

ওঃ, ঐ সতের-আঠার বছর বয়সের মেয়েটির নাম বুঝি শিপ্রা? মহিলাও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। শিপ্রার কৌতুহল বেড়ে গেছে। দেখতেই হবে যেন, ঠোঁটের ওপর তিলটা আছে কি নেই। কিন্তু শিপ্রা বলে মেয়েটি মাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। ছোট ছেলেটি ঘুম ভেঙে কাঁদতে শুরু করেছে। মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—'কতবার বলেছি মা, তোমার এই আদরের নাতি নিয়ে কোথাও যেও না, যেখানেই যাবে তোমার এই আদরের নাতি সঙ্গে নেওয়া চাই।'

ও! ঐটি তাহলে প্রৌঢ়ার নাতি? বুড়ো বয়সে বাচ্চা হয়েছে বলে, তাহলে শিপ্রা খামোকাই মনে মনে মহিলাকে দোষারোপ করছিলেন! ট্রেন থামল। বাপের হাত ধরে দুটি ছেলে মেয়ে নেমে গেল। বড় মেয়েটি বকতে বকতে, আদরের নাতিটিকে নিয়ে নামল। মহিলা কাপড় সামলে নিচ্ছেন, তাঁর পিঠ

শিপ্রার দিকে। প্ল্যাটফরম থেকে স্বামী জোর গলায় ডেকে বলল, 'আঃ কি করতাছ কনক, তাড়াতাড়ি নাইম্যা আস, ট্রেন ছাইড়া দিব।'

আর তখনই শিপ্রার মনে পড়ে গেল, সেই কালো হরিণ চোখের নাম ছিল, কনক। হ্যাঁ, কনকই তো! এই কি সেই কনক? তাই কি অমন হাসি হাসি মুখ করে প্রথম দিকে তাকিয়েছিল? ও কি চিনতে পেরেছিল শিপ্রাকে? কারণ লোকে বলে শিপ্রার চেহারার বিশেষ বদল হয়নি। মণ্টু কনকদের বেঞ্চিটায় বসে পড়ে বললে, 'এইদিকেই জানলার কাছে এসে বসুন বড়দি, হাওয়া পাবেন।'

ওঃ, মণ্টুরা একবারও যদি ভুল করে ঐ মহিলার সামনে শিপ্রাদি বলে ডাকত! হয়তো মহিলা বলে বসতে পারত—আচ্ছা আপনি কি কোনদিন বেলেঘাটায় থাকতেন? হয়তো? কিন্তু আধময়লা বেশবাসে ক্লান্ত মহিলার হয়তো সাহস হয়নি ভাবলেশহীনমুখী শিপ্রাকে কিছু বলতে! আর তাই হয়তো এই ট্রেনের কামরায় শিপ্রা গুপ্তর জীবনের যে একটা ছেঁড়া পাতা ঝল-মলিয়ে উঠতে পারত কিছুক্ষণের জন্য, তা আর হল না।

ক্লান্ত পায়ে শিপ্রা গিয়ে বসলেন জানলার ধারে। দুর্বল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্টেশনটার নাম কি ছিল মণ্টু?'

'এই রে! দেখিনি তো! কাউকে জিজ্ঞাসা করব?'

'নাঃ, তেমন কিছু জরুরী নয়। এমনিই জিজ্ঞাসা করলাম।'

মণ্টু হঠাৎ উৎসাহভরে দেশের এই অবস্থায় যুব সমাজের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলে শিপ্রাকে চমকিত করবার প্রয়াস পেল। থামিয়ে দিলেন শিপ্রা তাকে। তারপর ব্যাগ থেকে ডায়রী বার করতে করতে অভ্যস্ত হাসি ঠোঁটে টেনে এনে বললেন—'এখন ওসব কথা থাক মণ্টু। কাল মিটিং সম্পর্কে কয়েকটা কথা নোট করে নিই।'

কিন্তু কী লিখলেন শিপ্রা তাঁর ডায়রীতে?

অব্যক্ত

—'আপনি এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও সাঁতার কাটতে নামলেন না তো?' বারান্দার এক কোণে একটা বেতের চেয়ারে ম্লান ক্লান্ত চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসেছিল যে মেয়েটি কিংবা মহিলা, তাকে চমকে দিয়ে এই স্বাস্থ্যে ভরপুর আর খুশীতে উজ্জ্বল যুবকটি প্রশ্ন করে বসল।

—'ওঃ, আপনি! সাঁতার খুব একটা ভাল জানি না।'

—'খুব একটু কম ভাল জানেন তো!'

—'তা জানি।'

—'তবে ভয়টা কিসের?'

—'ভয় না, সংকোচ।'

—'কিসের?'

—'শাড়ী পরে ঐ একটু ডুবই দেওয়া যায়, তার বেশী—'

—'কসটিউম আনেননি?'

—'হ্যাঁ। না মানে ভাবছিলাম—'

—'পোশাক এনেছেন অথচ—'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল যুবক।

—'ঠাট্টা করছেন নাকি?'

—'নাঃ, একেবারেই না। ভাবছি নিজেকে কি বঞ্চিতই করছেন!'

—'একলা এসেছি—মানে তাই খুব—না একটু সংকোচ।'

—'চলুন না এই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। বীচ একদম ফাঁকা থাকবে।'

—'আমাকে ভাল করে শিখিয়ে দেবেন তো?'

—'শেখাব।'

স্থানটা ধরা যাক পুরীর সমুদ্রপারের কোন হোটেল। আর সময় এই বেলা দশটা কিম্বা এগারটা।

—'আপনি খুব ভাল সাঁতার কাটেন। আপনি যখন ব্রেকার পার হয়ে চলে যান—সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়।'

—'আপনি ?'

—'বাঃ রে! আমিও তো সবার মধ্যেই!'

—'আপনার ব্রেকার পার হতে ইচ্ছে করে ?'

—'খুব, কিন্তু—'

—'কি, কিন্তু ?'

—'আমি যতটুকু সাঁতার জানি—তাতে কোনদিনই তো সম্ভব হবে না!'

—'এই যে বললেন আমার কাছে শিখবেন ?'

—'এতটা কি শিখতে পারব যে এত বড় বড় ঢেউ পেরিয়ে—'

—'আমি কেমন সাঁতার কাটি ?'

—'বললাম তো এখুনি।'

—'তাহলে হয়তো শেখাতেও পারব ভাল! কি, বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

—'আমি কেমন ছাত্রী তা তো জানি না!'

—'দেখা যাক! আপনার নাম ?'

—'পার্বতী—পার্বতী সরকার।'

—'আমার—সতীন্দ্র সোম।'

দুপুরের রোদে সমুদ্রপারের বালি এমন তেতেছে পা ফেলা দায়। ওরা দুজনে দাঁড়াল এসে, যেন স্কুল পালিয়ে এসেছে। আকাশের ঠিক মাঝখানে সূর্য তখন। সমুদ্রের ধারে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

—'আশা করি, শাড়ীর নীচে সাঁতারের পোশাকটা পরে এসেছেন ?'

—'হ্যাঁ।' পার্বতী লজ্জিত হল।

—'আমি সমুদ্রে নামছি। আপনি শাড়ীটারিগুলো পুঁটুলি পাকিয়ে এই চালাটার কাছে রেখে চলে আসুন। ভয় নেই, কেউ নেবে না!'

জোয়ারের সময়। পূর্ণিমাও খুব কাছে এসে গেছে নিশ্চয়ই। তাই ঢেউগুলো যখন প্রায় একতলা সমান উঁচু হয়ে ছুটে আসছে, পার্বতী অনেক আগে থেকেই চোখ বন্ধ করে ফেলছে। সতীন্দ্র পার্বতীর ভয় দেখে হাসছে।

তারপর হাত ধরে একসঙ্গে ডুব দিচ্ছে। ঢেউ ওদের ওপর দিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে বালির ওপর।

—'ওঃ, আপনি ডগ সুইমিং ছাড়া কিছুই জানেন না!'

—'তাহলে তখন কি বললাম আপনাকে!' লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল পার্বতী।

—'এই দেখুন আমি কেমন করে সাঁতার কাটছি। লক্ষ্য করুন ভাল করে।'

—'ঢেউ এসে গেছে যে!'

—'ডুব দিন তাহলে।'

জল থেকে মাথা তুলে পার্বতী বললে—'নাঃ আমার দ্বারা হবে না।'

—'সত্যি হবে না, এত ভয় পেলে কিছু হয়? নিন্ আমার হাত ধরে চেষ্টা করুন।'

চলল চেষ্টা। সূর্য হেলেছে পশ্চিম দিকে, আকাশের দিকে তাকিয়ে পার্বতী বললে,—'চলুন এবার। এক্ষুনি তো একে একে টুরিস্টদের ভিড় শুরু হয়ে যাবে।'

—'যান আপনি উঠুন আগে। ঐ শাড়ী-টারিগুলো জড়িয়ে নিন, আমি আসছি।'

পার্বতী যখন উঠে এল সেই চালাটার কাছে তখনও সমুদ্রতীর প্রায় তেমনি নির্জন, সমুদ্র তেমনি উদাসীন। অনেক দূরে দু-একজন নুলিয়াকে দেখা যাচ্ছে। ভাল লাগছে পার্বতীর, খুব ভাল লাগছে। অবগাহন স্নান। মুক্ত স্নান। সত্যি ভাল সাঁতার না জানলে যেন সমুদ্রকে ভালবাসা যায় না। সমুদ্রকেই তো কতদিন ধরে ভালবাসতে চেয়েছে পার্বতী।

—'চলুন!' পেছন থেকে বলে উঠল সতীন্দ্র; অবশ্য দুজনকে যে একসঙ্গেই ফিরতে হবে হোটেলে এমন কোন কথা নেই।

—'বরং না ফেরাই ভাল।' বললে পার্বতী।

—'ভয় করছে কে কি বলবে?'

—'সত্যি! এখানে কেউ আমাকে চেনে না, আমিও কাউকে চিনি না। এ আজ আসছে কাল চলে যাচ্ছে। আমিও তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাব। তবু দেখুন এত ভয়!'

—'বাঙালী মেয়ের বিশেষত্ব! একলা এসেছেন কেন?' একটু কি চটে উঠল সতীন্দ্র?

—'আজ বিকেলে আর সাঁতার কাটতে আসবেন না?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল পার্বতী।

—'আপনি হোটেলে ফিরে যান, আমি বিকেলের সাঁতারটা সেরে একেবারে ফিরব।'

ফিরে চলল সতীন্দ্র সমুদ্রে।

ডাইনিং রুমের একেবারে একটা কোণে রোজ একলাই খেতে বসে পার্বতী। আজও এসে বসল। এর আগে ওর সঙ্গে কেউ আলাপ করতে আসেনি। সাতদিন ও এসেছে এখানে, বয়স হল ত্রিশ-বত্রিশ। আর ও যে এ্যাট্রাকটিভ নয় সে কথা ওর চেয়ে বেশী আর কে জানে? তাই কেউ আলাপ করতে আসেনি বলে ও আশ্চর্যও হয়নি। আর নিজে তো পারেই না কারো সঙ্গে আলাপ করতে। ও একা এসেছে, একা ছাড়া ওর উপায় ছিল না। একা আসা ওর দরকার ছিল। ডাইনিং রুমে এসে কোন দিকে তাকায়ও না কোনদিন। আজ চারদিকে চেয়ে ও সতীন্দ্রকে খুঁজল। না, কোন টেবিলে সতীন্দ্র নেই। তবু ঢোকবার সময় বা বেরুবার সময় যেটুকু দেখেছে, ঐ উল্টোদিকের কোণের টেবিলটাতেই তো দেখেছে। এখনও আসেনি বোধহয়। অনেক লোক খাওয়া শেষ করে চলে গেল। অনেক নতুন লোক এল। অনেক বিদেশীও আছে এর মধ্যে, তারা ভারতবর্ষের এই বিখ্যাত বীচ দেখতে এসেছে। আর এসেছে কোনারকের মন্দির ইত্যাদি দেখতে। আবার কিছু লোক আসে হয়তো কেবল মদ খাবার জায়গা বদলাতে। সামনের ঐ দুটো লোককে তো পার্বতী যখনই দেখেছে মদের গ্লাস ছাড়া দেখেনি। পার্বতীর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। কই, সতীন্দ্র এখনও এল না তো! ক্রমে ডাইনিং রুম ফাঁকা হতে লাগল। রাত ন'টা বেজে গেছে, খাওয়া শেষ করে পার্বতী তবু বসে রইল। শেষ দু'চারজন যারা ছিল তারাও উঠল। মাতাল দুজনও। পার্বতী উঠে পড়ল।

সতীন্দ্র সারা সন্ধ্যেটা ঘরে বসে রইল, একটু মদ খেল, চিঠি লিখল দেবলীনাকে। লিখেছিল পার্বতীর কথা। কেমন একটা মেয়ে—সতীন্দ্রর চেয়ে হয়তো সামান্য বড়ই হবে বয়সে, কেমন বিষণ্ন হয়ে বসে থাকত লাউঞ্জে। সমুদ্রের ধারে কেমন অদ্ভুতভাবে শাড়ী জড়িয়ে জড়িয়ে পরে বিষণ্ন হয়ে বসে অন্যের সাঁতার কাটা দেখত। তাকে আজ সতীন্দ্র জোর করে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে কেমন বদলে দিয়েছে প্রায়। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল সতীন্দ্র। এমনি আবার চিঠি লিখল।

সাঁতার কাটতে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে, ডাইনিং রুমে খেতে খেতে কখন না মনে পড়ে দেবলীনাকে ? আজ দেবলীনার যে চিঠিটা পেয়েছে, খুব মিষ্টি চিঠি। দেবলীনার ঠোঁটের মত। মাকেও একটা চিঠি লিখল সতীন্দ্র। মায়ের দেবলীনাকে পছন্দ নয়। বড্ড বেশী সুন্দরী, বড্ড বেশী কথা বলে আর বড্ড বেশী সিগারেট খায়। মাকে মানবে না। এখন মা যদি প্রি-হিস্টরিক যুগে পড়ে থাকতে চায় আই কাণ্ট হেল্প—ভাবল সতীন্দ্র। দেবলীনাকে কেন্দ্র করেই মা আর সতীন্দ্রর বন্ধুত্বে একটা চিড় খেয়েছে। মাকে ভালবাসে ও, বাড়িতে থাকলেই সব সময় মায়ের বিষণ্ণ মুখ দেখতে হবে। তাই অফিস ছুটি নিয়েছে। যদিও ওর পজিশনের অফিসারের ছুটি নেওয়া মুস্কিল ছিল। মাকে একটা অজুহাত দেখিয়ে এখানে চলে এসেছে সতীন্দ্র। মাকেও লিখতে গেল পার্বতীর কথা, লিখল না। লিখল—

মামণি,

'দেখ দেবলীনা খুব খারাপ বউ হবে না। মামণি, দোহাই তোমার, তুমি খুশী হও।'

তারপর বেয়ারাকে ডেকে ঘরেই খাবার দিতে বলল। আর খেতে খেতে ভাবল পার্বতীকে। এমনি কেমন জড়ভরত লাগে পার্বতীকে। সাঁতারের পোশাকে কিন্তু মোটেই সেরকম লাগছিল না। অমন বিশ্রীভাবে থাকে কেন মেয়েটা ? ..

—'কি, কি ভাবছেন একলা বসে বসে ? আরে ব্বাস ! গলায় একটা মাফলার জড়িয়েছেন কেন ?' আজও প্রায় পার্বতীকে চমকে দিয়েই জিজ্ঞাসা করল সতীন্দ্র। আজও বারান্দার কোণে সেই বেতের চেয়ারটায় গুটিশুটি হয়ে বসেছিল পার্বতী।

—'একটু সর্দি-সর্দি লাগছে।'

—'প্রথম দিনের পক্ষে খুব বেশীক্ষণ জলে ছিলেন তো, তাই ওরকম মনে হচ্ছে। আজ দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। দুপুরে আসছেন তো ?'

—'আসব ?'

—'বাঃ, তা নইলে যা শিখেছেন সব তো ভুলে যাবেন।'

—'কাল আপনাকে ডাইনিংরুমে দেখলাম না।'

—'ঘরে বসেই ডিনার সেরে নিলাম। তাছাড়া দুটো দরকারী চিঠি লেখবার ছিল।'

—'বাড়িতে ?'

—'হ্যাঁ।'

পার্বতী আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হোটেল ঝেঁটিয়ে সবাই গেছে বেলাভূমিতে। হয়তো কিছু মাতাল এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সমুদ্র-স্বাদ অনুভব করছে। কে জানে? দূরে বেয়ারারা ব্রেকফাস্টের জন্য টেবিল সাজাচ্ছে। সতীন্দ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—'আপনি আজ সকালে সাঁতার কাটতে গেলেন না?' অবশেষে বলল পার্বতী।

'—নাঃ, কাল চিঠি লিখতে দেরি হল, তাই খেতে দেরি, ঘুমুতে দেরি, আর আজ উঠতে দেরি। যাকগে দুপুরে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।'

—'ওখানে সকলে আপনাকে মিস করবে। অনেকেই আপনার ব্রেকার পার হওয়া দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে।'

—'কেন? অনেকেই তো পার হয়।'

—'কজন আর? বিশেষ করে আপনার মত রোজ রোজ?'

—'তাহলে আজ বিকেলে দুটো ব্রেকার পার হব!'

পার্বতী সতীন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল— 'আপনার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়।'

—'কত ভোরে উঠেছেন? সূর্যোদয় দেখেছেন?'

—'না, আজ দেখিনি।'

—'এসেই গোড়ার দিকে খুব দেখে নিয়েছেন বুঝি? সকলেই তাই করে অবশ্য। প্রথমে যে উৎসাহটা থাকে—'

—'না, আরও অনেকদিন আগে, অনেকবার অন্য সমুদ্রের মাঝখান থেকে।'

—'অন্য সমুদ্র?'

—'আরব উপসাগর।'

—'কোথায়?'

—'বম্বেতে।'

—'বম্বেতে বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

—'না, ওখানে থাকি, মানে…'

—'আশ্চর্য তো, আপনি বম্বে থেকে বেড়াতে এসেছেন এখানে! অথচ আশে-পাশে যে সমস্ত দ্রষ্টব্য আছে সে-সবও তো একদিন দেখতে গেলেন না!'

পার্বতী হাসল।

—'চিঠিগুলো পোস্ট করবেন না?'

—'ওঃ হ্যাঁ, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছেন তো! যাই বাক্সে ফেলে দিয়ে আসি। ভুলে গেলে ওদিকে আবার…।' সতীন্দ্র দ্রুত চলে যায়।

মেঘে সূর্যটা ঢাকা পড়েছে। সমুদ্রের জল কালো মেয়ের কালো চোখের মত গহীন কালো আর অর্থবহ হয়ে উঠেছে যেন।

—'মাত্র চারদিনে এতটা উন্নতি হবে ভাবিনি কিন্তু আমি।' বললে সতীন্দ্র।

ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে সতীন্দ্র ভেজা বালির উপর। পার্বতীও ক্লান্ত, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওরও। কিন্তু কেমন দেখাবে? তাই জোর করেই দুই হাত দিয়ে দুটো হাঁটুকে বুকের কাছে চেপে ধরে বসে আছে ও। মুখ তুলে বললে—'সবটাই আপনার কৃতিত্ব।'

—'কাল গোড়াতে এসেই আপনাকে ব্রেকার পার করাব।'

—'পারব?'

—'সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয় পেয়ে পেয়ে এত বড়টা হলেন কি করে ভাবছি।'

—'বলুন এমন বুড়ীটি হলেন কি করে—'

—'ফের যদি আপনি নিজেকে বুড়ী বলেন, তবে—'

হাসল পার্বতী।

—'বম্বেতে থাকেন তো জুহুতে গিয়ে সাঁতার শেখেননি কেন?'

—'অসুবিধে ছিল।'

—'ও! মা-বাবা পছন্দ করেন না?'

—'ঐরকম সব আর কি!'

এবার ঢেউটা এসে প্রায় ওদের গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল।

—'আমাদের আর একটু পেছিয়ে বসতে হবে বোধহয়। নইলে এর পরের ঢেউটা এসে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে সমুন্দুরে।' বললে পার্বতী।

সতীন্দ্র উঠে বসল। মেঘ আরও কালো হয়ে এসেছে। সমুদ্রও। পার্বতী চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে। কিন্তু ভাবছে দেবলীনার কথা। দেবলীনার চিঠির কথা। অদ্ভুত মেয়ে এই দেবলীনা। লিখেছে,

'সেদিন মিসেস সোম-এর সঙ্গে একটা পার্টিতে—' আমার মাকে এখনও দেবলীনা মিসেস সোম বলে কেন? ভাবল সতীন্দ্র। 'মিসেস মল্লিকের সঙ্গেই কথা বলছিলেন অবশ্য—মেয়েদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে ছোটখাটো একটা

বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। বুঝতেই পারছ, আসল লক্ষ্য ছিলাম আমি। সনু, আমি তোমাকে বলছি এসব আমার ভাল লাগে না। আমি স্ট্রেট ব্যবহার ভালবাসি। আর সেইজন্যই আমার মনোভাব আমি তোমাকে খুলে বললাম। ডার্লিং, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। সিগারেট ছাড়াও। সনু ডার্লিং, যেদিন আমাকে তুমি তোমার ভালবাসার কথা প্রথম বলেছিলে মনে পড়ে? সেদিনও সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝখানেই তোমার কথা শুনে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।……'

সেদিন ছিল টুসকীর জন্মদিনের পার্টি। টুসকী দেবলীনার ছোট বোন। দেবলীনা কেমন করে একবার সতীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে উঠে গিয়েছিল ছাতে। আর তখনই জীবনের একটা পরম প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা হয়েছিল. ওপরে ছিল তারা আর একফালি চাঁদ। দেবলীনার গায়ে ছিল বিলিতি সেন্টের গন্ধ। বাতাসে দামী সিগারেটের ধোঁয়া। সব মিলিয়ে অদ্ভুত মাদকতার সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যি তো, সেদিন একটুও খারাপ লাগেনি দেবলীনাকে। বরং…। তবে? মা, মা তোমাকে মেনে নিতে হবে। ভাবল সতীন্দ্র।

পার্বতীর মা কলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছেন।—'পারু, তোর ডিভোর্স নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। দীপনারায়ণ একতরফা ডিগ্রী পেয়েছে। আমি বলি, এ ভালই হল। জানি এমনিতে তোর মনখারাপ হবে না। তবু যখন সব ভেঙে যায় মেয়েদের, হাজার হলেও একবার মনখারাপ হবেই হবে। একটু কাঁদবেই কাঁদবে। তুই জেদ করে চলে গেলি বেড়াতে। তাই মাঝে মাঝে একটু ভয় করছে। কাল-পরশুর মধ্যে রওনা হয়ে চলে আয় কলকাতায়। দীপনারায়ণ কি কাজে কলকাতায় আসছে লিখেছে। তোকে কিছু টাকা দিতে চায়। এখন টাকার কিরকম দরকার বুঝিস তো! গোঁয়ার্তুমি করে টাকাটা নিবি না বলিস না যেন! হ্যাঁ, তোর বড় মাসী তোর একটা চাকরি ঠিক করেছে। ওদেরই কিণ্ডারগার্টেন সেক্সনে পড়াতে হবে। ভাল করে খাচ্ছিস তো?'

সতীন্দ্রর মা লিখেছে……'সাঁতার তোর নেশা। কিন্তু লক্ষ্মী সনু, বেশী দূরে যাস না। জানি তুই সাবালক। নিজে রোজগার করছিস। দুদিন পরে বিয়ে করবি। তবু আমার কাছে তুই সেই ছোট্ট সনু।'…ওঃ মাগো, দয়া করে আমাকে আর ছোট্ট করে রেখো না মা……

—'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।' আবৃত্তির ভঙ্গীতে বলে উঠল সতীন্দ্র।

পার্বতী চমকে জিজ্ঞাসা করল—'কি হল ?'

—'উচ্ছ্বাস !' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সতীন্দ্র।

খিলখিল করে হেসে উঠে পার্বতী বললে—'অভিনব উচ্ছ্বাস। নির্জন সমুদ্রের ধারে বসে রবীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতার লাইন খুঁজে পেলেন না !'

—'স্কুলের কমপিটিশনে ঐ একটা কবিতাই মুখস্থ করেছিলাম যে, তাই সমুদ্রে পাহাড়ে জঙ্গলে ঐটেই সম্বল।'

একটা ঢেউ এসে ওদের ওপর ভেঙে পড়ে হিড়হিড় করে ওদের খানিক টেনে নিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে—হেসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। সরে এল পারের দিকে।

—'চলুন ফেরা যাক।' বললে সতীন্দ্র।

—'আর একটু বসি না !' বললে পার্বতী।

—'বসবেন ? ঢেউগুলো কিরকম উঁচু হয়ে আসছে দেখেছেন ? আজ কি পূর্ণিমা ?'

—'না কাল পূর্ণিমা হয়ে গেছে।'

—'আজও তাহলে খুব চাঁদের আলো থাকবে।'

—'আসবেন ডিনারের পর ?'

আজ চাঁদের আলোতে হোটেলসুদ্ধ লোক উপস্থিত থাকবে কিন্তু এখানে।'

—'থাকুকগে !'

—'পাছে লোকে কিছু বলে—ওটার কি হবে ?'

হাসল পার্বতী।

বৃষ্টি শুরু হোল টিপটিপ করে, সমুদ্র হোল ঝাপসা।

—'রাতে চাঁদ উঠবে তো ?' বলল সতীন্দ্র।

—'এ মেঘ কেটে যাবে মনে হয়।'

—'যাই, হোটেলে চিঠি লেখার পর্বটা শেষ করে ফেলিগে তাহলে বেলাবেলি।'

—'আপনি কি রোজই চিঠি লেখেন ?'

—'রোজই।'

—'কাকে এত লেখেন ?'

—'একজনকে কথা দিয়ে এসেছি যে রোজই চিঠি দেব।'

—'ওঃ।'

—'একদিন চিঠি না দিলে হয়তো এমন কাণ্ড করে বসবে!'

—'ওঃ।'

—'ভয় যখন কেটেছে, আসুন না ডিনারটা একসঙ্গে সারা যাক দুজনে।'

—'বেশ তো।'

—'আমি তাহলে এগোই—'

—'আসুন—আমিও উঠব এখনই—।'

—'আমি আপনাকে আপনার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাব খাবার আগে—' যেতে যেতে বলল সতীন্দ্র।

আবার একবার সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে হল পার্বতীর। আর একবার অবগাহন করি, ভাবল ও।

একটু সাজল পার্বতী। আইব্রাও পেন্সিলে চোখ আর ভুরু আঁকল। ভুরুটা বড্ড পাতলা সত্যি। লিপস্টিক লাগাল ঠোঁটে। হাল্কা নীলের ওপর লাল সুতোর এমব্রয়ডারী করা শাড়ি পরল। সঙ্গে হাতকাটা একটু গাঢ় নীল ব্লাউজ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজেকে দেখতে লাগল পার্বতী। আসছে না কেন সতীন্দ্র এখনও?

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সতীন্দ্র খাটের ওপর। দুই করতলের ওপর রাখল মাথা। পরেছে ক্রীম রং-এর প্যাণ্ট। গায়ে মেরুন রং-এর শার্ট। যদিও সমুদ্রস্নানে একটু কালো হয়েছে তবু মেরুন রং-এর পাশে ওর ফর্সা রং উজ্জ্বল হয়েই জানান দিচ্ছে। সেজেগুজে বের হবার মুখেই কি মনে করে শুয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলে রাখা দেবলীনার ছবিটার দিকে। আসবার সময় ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেবলীনাই ছবিটা দিয়ে দিয়েছিল সতীন্দ্রকে। সতীন্দ্র ভাবল, এ কি করছি। এতটা কি ঠিক হচ্ছে? পার্বতী যদি অন্য কোন আশা পোষণ করে থাকে? কিন্তু কেনই বা করবে? আজ পর্যন্ত এমন কোন ব্যবহার আমি করিনি যাতে করে কোনরকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে! এক নং—মিস সরকার ছাড়া অন্য কিছু বলে ডাকিনি। দুই নং—ভুলেও তুমি বলিনি। সেদিন যখন স্ট্রোকটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছিল না তখন তো মনে হয়েছিল একবার বলি, তোমার দ্বারা কিছু হবে না! তুমি কেটে পড়।—তখনও মুখে বলেছিলাম, আপনার মত মাথা মোটার দ্বারা কিস্সু হবে না, তুমি বলিনি। তিন নং—দরকার ছাড়া একবারও হাত ধরিনি বা ছুঁইনি। চার নং—এমন কথা

বলিনি—চলুন না শহরে দোকানে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করি। পাঁচ নং—দোকান থেকে কিনে এনে একটা জিনিসও উপহার দিইনি। অথচ এর মধ্যে আমি চার-পাঁচবার দোকানে গেছি, ঘুরে ঘুরে দেখেছি। মায়ের জন্য, দেবলীনার জন্য, এমন কি বাড়ির বাচ্চা চাকরটার জন্যও বেশ কয়েকটা জিনিস কিনেছি। তবে শো-কেসে এদেশী একটা তাঁতের মাল্টিকালার শাড়ী দেখে মনে হয়েছিল যে শাড়িটাতে পার্বতীকে মানাবে ভাল। এই মাত্র। তবে? আমার মন পরিষ্কার। অস্ফুটে বলে উঠল সতীন্দ্র। ভালই হয়েছে, ফিরে এসেই দেখা হয়েছিল ছেলেবেলার বন্ধু সমর-এর সঙ্গে। এসেছে ভুবনেশ্বরে, অফিসের কি একটা কাজে। সেখান থেকে বেড়াতে এসেছে পুরীতে। অফিসেরই কার সঙ্গে যেন, আছে টুরিস্ট লজে। জোর করে কথা আদায় করে নিয়েছে সমর, কাল সমরের সঙ্গে যাবে কোনারক দেখতে। সেইমত ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কই, পার্বতীকে ছেড়ে যেতে হবে বলে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তো! তবে?

মায়ের চিঠিটা আবার পড়তে বসল পার্বতী। দীপনারায়ণ আসছে কলকাতায়, দীপনারায়ণ শাঠে। পার্বতীর বাবা গিয়েছিল সপরিবারে বম্বেতে। অফিসেরই কাজ উপলক্ষ্যে। ঐ অফিসেরই এক ক্ষুদে অফিসার ছিল তখন দীপনারায়ণ, আলাপ হল। জুহুবীচে বেড়ানো, দীপনারায়ণ হল পার্বতীর দীপ। দীপ! তারপর বিয়ে। জুহুতেই ছিল ওদের বাড়ি। দীপ আর সমুদ্র, সমুদ্র আর দীপ দুই-ই হয়ে উঠল পার্বতীর নেশা, দীপ চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করল। বাড়তে লাগল ব্যবসা। প্রায় প্রত্যেক রবিবার বম্বে থেকে দীপের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন আসত সমুদ্রস্নানের জন্য। পার্বতীকে রাঁধতে হোত। কতরকম রান্নাই শিখেছিল পার্বতী! একদিন দীপের বন্ধুবান্ধবই জোর করেছিল ওদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে হবে বলে। সাঁতারের পোশাক পরে গিয়েছিল সমুদ্রে। সেদিন খুব ভাল লেগেছিল ওর। ওরা সবাই সন্ধ্যেবেলা বিদেয় হবার পর দীপ বলেছিল, 'ঐ পোশাক তুমি না পরলেই পার! ঐরকম সরু সরু পায়ে ভাল লাগে না তোমাকে।' লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল পার্বতীর। সত্যি, বসন্ত-র বউ ঊষা বা বিজয়ের বোন সুমিত্রার মত অত ভাল গড়ন তো পার্বতীর নয়। তাই পার্বতী বালুর ওপর বসে ওদের চান দেখত। আর দেখতো সমুদ্র। দীপনারায়ণের বিজনেস বাড়ল। সমুদ্র দেখা কমল। তাই একলাই বসে বসে সমুদ্র দেখত পার্বতী। আর ভালবাসত। ঢেউগুলোকে ভালবাসত। চিঠিটা পড়ে রয়েছে সামনে। একতরফা ডিগ্রী হয়েছে। পার্বতীর নামেই এ্যাডাল-

টারীর কেস এনেছিল দীপনারায়ণ। হায় রে! পার্বতী কথা দিয়েছিল কোর্টে উপস্থিত হবে না। হয় নি। আজ পার্বতার মুক্তি। মা লিখেছে ও কাঁদবে। না, একটুও কান্না পাচ্ছে না তো! বরং ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে। মুক্তির স্বাদটা চেখে চেখে দেখতে ইচ্ছে করছে। এখুনি আর একবার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে। কিন্তু সতীন্দ্র আসছে না কেন? আটটা বেজে গেল। অনেক আগেই চাঁদ উঠে গেছে। ঢেউগুলো ভাঙছে আর চাঁদের আলোতে চিক চিক করছে নিশ্চয়ই। সতীন্দ্র সাঁতার কাটলে ওর চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সেই প্রথম দিন থেকেই। সতীন্দ্র কাকে এত চিঠি লেখে? প্রেমিকা? হবেই বা না কেন? যাকগে! হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছে, কাল বা পরশুর মধ্যে কলকাতা ফিরে যাবার টিকিট করে দিতে। সতীন্দ্র কি ভয় পেয়েছে? কি আশ্চর্য! কাল বা পরশু তো চলেই যাচ্ছি আমি। নাঃ, ওর ভয়টা ভেঙে দেওয়া উচিত। আমার কোন কুমতলব নেই রে বাবা!

উঠে পড়ল পার্বতী।

—'কাম ইন, শুয়ে শুয়েই বলল সতীন্দ্র। আর পার্বতীকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়ে বলল—'আরে আপনি!'

—'বেশ লোক তো আপনি!' বললেন আমাকে ডেকে নিয়ে ডিনার খেতে যাবেন, আর—'

—'এই তো যাচ্ছিলাম।' নিজের ছেড়ে রাখা আণ্ডারঅয়ার ইত্যাদি তোয়ালে দিয়ে চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সতীন্দ্র।

—'কার ছবি ওটা?'

—'ওই যাকে রোজ চিঠি লিখতে হয়।'

—'খুব সুন্দর দেখতে তো?'

—'তা ঠিক।'

—'আপনি ভাগ্যবান।'

—'তা ঠিক। চলুন।'

খাওয়ার শেষে সিগারেট ধরাতে গিয়ে কি মনে করে সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলে সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে।

—'ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই না।'

—'ওঃ! কিন্তু খান না কেন?'

—'খাইনি কোনদিন। আর মেয়েরা মানে আমাদের দেশের মেয়েরা সিগারেট খাচ্ছে আমার কেমন ভাবতে ভাল লাগে না।'

—'এটা তো একটা কুসংস্কার!'

—'ভাল কুসংস্কার।'

—'তার মানে যে সব মেয়েরা সিগারেট খায় আপনি তাদেব খারাপ বলবেন!' রেগে উঠে বলে সতীন্দ্র।

'হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন? আমি কি তাদের খারাপ বলেছি? আপনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন খাই না, তাই আমার ধারণার কথাটা আপনাকে বললাম। বম্বেতে অনেক মেয়েকে আমি সিগারেট খেতে দেখেছি। তাদের মধ্যে অনেকেরই গলা কেমন হোর্স হয়ে গেছে।'

—'অনেকেরই, সকলেরই যে ওরকম হবে তাব কোন মানে নেই।'

—'তা অবিশ্যি নেই।'

—'আপনার বিয়ের পর আপনার স্বামী যদি চান আপনি তার সঙ্গে ড্রিংক করুন, সিগারেট খান, তাহলে আপনি তা করবেন না?'

—'বড্ড মুস্কিলেই ফেললেন দেখছি, কি উত্তর দিই বলুন তো আপনাকে? মানে—আমি—মানে আর বিয়ে করব না ঠিক করেছি।'

—'আর—মানে? বয়স হয়ে গেছে ভাবছেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পার্বতী বললে—'আপনার বৌকে যে আপনি সিগারেট আর মদ ধরাবেন সে বিষয়ে এ্যাটলিস্ট কোন সন্দেহ নেই।' হাসল পার্বতী।—'দেখেছেন ডাইনিং-রুম ফাঁকা হয়ে গেছে, সবাই সমুদ্র দেখতে চলে গেছে।'

—'আমাদেরও তো যাবার কথা ছিল।' বলল সতীন্দ্র।

—'তাহলে এরকম বাজে ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া না করে চলুন তাড়াতাড়ি।'

—'চলুন। আপনি কিন্তু এই ক'দিনেই খুব স্মার্ট হয়ে গেছেন। তা গোড়ার দিকে অমন দুঃখী-দুঃখী ভাব করে বসে থাকতেন কেন?'

পার্বতী হাসল।

সমুদ্রের ধারে এল দুজনে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত লোকই দেখছে চাঁদ আর সমুদ্র। কত বয়সের কত রকম লোক। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরেই চলে এল ওরা।

—'কাল আপনাকে নিয়ে ব্রেকার পার হবার কথা ছিল। কিন্তু—' ইতস্ততঃ করলে সতীন্দ্র।

—'কিন্তু কি ?'

—'ফিরে দেখি আমার অনেকদিনের বন্ধু এসেছে। টুরিস্ট লজে উঠেছে। সে ধরেছে আমাকে নিয়ে কোনারক যাবেই যাবে। তাই কালকের দিনটা ছুটি চাই। ব্যাপারটা অন্যরকম ভাবে নেবেন না কিন্তু আপনি !'

—'না না, তা কেন নেব। ভালই হল, আমিও বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। কাল আমিও বোধহয় আসতে পারব না। কলকাতায় ফিরতে হবে। ম্যানেজারকে বলেছি কালই যেন একটা বার্থ রিজার্ভ করে দেয়।'

—'তার মানে ? আমি ফিরে আসবার আগেই আপনি চলে যাবেন নাকি ?'

—'অগত্যা। অবশ্য যদি টিকিট পাই।'

—'তার মানে, ব্রেকার পার হওয়া আপনি শিখবেন না ?'

—'কই আর হল শেখা !'

—'না, তা হয় না।'

—'কি হয় না ?'

—'কোন জিনিসই অর্ধেক শিখে ফেলে রাখা উচিত নয়।'

—'সমুদ্রের ধারে জীবনে হয়তো আর আসাই হবে না।'

—'বম্বে ? জুহু ?'

—'বম্বেতে আর যাচ্ছি না।'

—'কোথায় যাবেন ?'

—'আপাততঃ কলকাতাতেই থাকব।'

—'আর দুদিন বেশী এখানে থাকতে আপত্তি কি ?'

—'সত্যি কথা বলি আপনাকে। কেমন একটা জেদ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। হয়তো আর মাত্র দুদিনের হোটেলভাড়াই আছে আমার কাছে।'

—'আমার কাছে টাকা আছে, ধার নিন।'

—'শোধ দেব কি করে ?'

—'নাই বা দিলেন ?'

—'কলকাতায় আমাকে তাড়াতাড়ি যেতেই হবে। আমাকে একজন কিছু টাকা দিতে আসবে।'

—'কে ? কত টাকা ?' বলেই লজ্জিত হল সতীন্দ্র। বড় বেশী কৌতুহল প্রকাশ হয়ে গেল যেন।

—'আমার এক্স-হাসব্যান্ড। আন্দাজ করছি দশ হাজার দেবে অন্ততঃ।'

আর কথা নেই। চুপচাপ হাঁটছে দুজনে। হঠাৎ পার্বতীর মনে হল, মিথ্যে মামলায় জিতেছে বলে বিবেক-দংশনে দীপ টাকা দিতে চাইছে! আর সতীন্দ্রর কাছে সবটাই বেসুরো হয়ে গেল কি? কিন্তু কেন? সত্যিই তো, আলাপটা কোনদিনই এমন জায়গায় যায়নি তো যে এতখানি ব্যক্তিগত কথা উঠতে পারে! আর তাই তো দেবলীনার ছবি দেখার পর পার্বতী কোন কৌতুহলই প্রকাশ করেনি। কিন্তু তবু সতীন্দ্রর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে কেন? হাঁটছে, কিন্তু সব ভাবনার ওপর দিয়ে বার বার একটা কথাই কানে বাজছে—'আমার এক্স-হাসব্যাণ্ড।'

—'কি হল, কথা বলছেন না যে? ডিভোর্স করা মেয়েদের কি আপনি খারাপ ভাবেন?'

—'ওঃ, তখন সেই সিগারেট খাওয়া মেয়েদের কথাটা ফিরিয়ে দিলেন বুঝি? নাঃ তা নয়, আমার কেমন মনে হত আপনার বিয়েই হয়নি! বম্বেতে বুঝি তিনি থাকেন? মানে আপনিও থাকতেন?'

—'হ্যাঁ জুহুতে। একেবারে সমুদ্রের ধাবে সেই বাড়ি। চলুন হোটেলে ফেরা যাক।'

—'চলুন। তাহলে সত্যি ব্রেকার পার হওয়া হল না আপনার? এ কিরকম হল জানেন? টেস্টে এ্যালাউ হবার পর পরীক্ষা না দেওয়া আর কি!'

সহজ হতে চাইল সতীন্দ্র।

—'টেস্টে এ্যালাউ হয়েছিলাম?'

—'নিশ্চয়ই। কলকাতার ঠিকানাটা কিন্তু আমাকে দিয়ে যাবেন।'

—'কেন? বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করবেন?'

—'যদি বিয়ে করি?'

—'যদি মানে? ছবিটা?'

—'ওঃ, হ্যাঁ!'

রাত অনেক হয়েছে। তবু চিঠি লিখতে বসল সতীন্দ্র।

......'লীনা, একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম সিগারেট খাওয়া মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। গলা হোর্স হয়ে যায়। আমার বৌ-এর গলা ছেলেদের মত শোনাবে'—এই পর্যন্ত লিখে থামল সতীন্দ্র। তারপর ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। মিথ্যে কথা কেন লিখতে হয়? আমার চাইতে দেবলীনা অনেক ফ্র্যাংক। নাঃ

দরকার নেই লিখে—একদিন চিঠি না লিখলে আর কি হবে ?

ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে গেল সতীন্দ্র সমর-এর সঙ্গে।

লাউঞ্জে তন্ময় হয়ে বসে সমুদ্রের ঢেউ-এর ওঠা-পড়া দেখছিল পার্বতী। এই রকম এক সমুদ্রের ধারেই আলাপ হয়েছিল দীপনারায়ণের সঙ্গে। সে আজ কতদূর পিছিয়ে গেছে। তবু কিছু ছবি কি স্পষ্ট হয়েই না সামনে আসে। আবার এই সমুদ্রের ধারেই আলাপ হল সতীন্দ্রর সঙ্গে। কিন্তু কত তফাত। 'এ কদিনেই কিন্তু আপনি অনেক স্মার্ট হয়ে গেছেন।' সত্যি এত মুক্ত এর আগে কোনদিন মনে হয়নি নিজেকে। দীপকে ভালবাসতাম খুবই, ভয়ও করতাম। নিজের শরীর নিজের অসাবলীলতা নিয়ে হীনমন্যতা যেন কিছুতেই কাটতে চাইত না। সতীন্দ্রর সামনে কখনও ওই হীনমন্যতা ভাবটা আসে না তো। সতীন্দ্র ওকে অনেকটা বদলে দিয়েছে একথা মানতেই হবে। আর এক জীবন-সংগ্রামে নামার আগে এই বদলটাও ওর খুব দরকার ছিল।

ম্যানেজার এসে বললে—'আজ হল না, কালকের টিকিট পাওয়া গেছে। বার্থ রিজার্ভ করে দিয়েছি।'

—'ধন্যবাদ।' বলল পার্বতী। একটু হাসল। মনটা হঠাৎ বলে উঠল, 'টিকিটটা না পাওয়া গেলেই কি চলত না! সতীন্দ্র যদি আজ না আসে? এমনও তো অনেকে করে, ঐ কোনারকেই থেকে যায় রাত্তিরটা, চাঁদের আলোতে মন্দির দেখবে বলে? না, অন্য কিছু না, একটা ধন্যবাদও দেওয়া উচিত তো?' সমুদ্রের দিকে চেয়ে কত কথাই যেন ভাবতে লাগল পার্বতী। নাঃ, যাই শেষবারের মত সাঁতার কেটে আসি একবার।

সমুদ্রের ধারে এসে দেখল একটু দূরে দুটো নুলিয়া বসে বিড়ি খাচ্ছে। কি আশ্চর্য, এ সময় তো কেউই থাকে না। একটু বিরক্ত হল পার্বতী। তারপর ওদের অগ্রাহ্য আর অবজ্ঞা করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

সতীন্দ্র আর সমরের কোনারক দেখা চলল। এক সময় সমর বলল—'কলকাতা থেকে হঠাৎ পালিয়ে এলি কেন?'

—'ওসব কথা ছাড় তো!'

একটু চুপচাপ আবার হাঁটল ওরা। সমর আবার শুরু করল—'গত রোববারে পার্থদের ডায়মণ্ডহারবার রোডের বাড়িটায় একটা পিকনিক গোছের ছিল। জানিস তো, আজকাল ড্রিংকস ছাড়া আমাদের মত উচ্চ মধ্যবিত্ত অথবা বলতে পারিস মধ্য

উচ্চবিত্তদের পার্টি জমে না। দেবলীনা একটু ড্রিংক করেছিল। তারপর গাছে কে চড়তে পারে না পারে এই নিয়ে কথা হতে হতে দেবলীনা জেদ করে গাছে চড়তে গিয়ে পা মুচকে ফেলেছে। বুঝতেই পারিস, সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঐ সময় সব দেখে মনে হল—মানে, ইয়ে—পার্থর দেবলীনাকে বড্ড বেশী ভাল লাগে।—আর—'

—'কারা করেছিল এমন মন্দির আর এমন সব মূর্তি ?' সতীন্দ্র বলল।

—'এড়িয়ে যাসনে কথা, তোর এই প্রশ্নের উত্তর দু'চারখানা বই পড়লেই পাবি। আমার কথা শোন, অনেক মেয়ে থাকে তারা ঐ জলের মত আর কি। যখন যে পাত্রতে থাকে, সেই রকম রং ধারণ করে। তুই সেখানে নেই, পার্থ একটু চেষ্টা করলেই পার্থর রং ও ধারণ করতে পারে। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। দেবলীনা ভাল মেয়ে, এখনও সরল। কেবল একটু ব্যক্তিত্ব কম। তবে যাই বলিস, স্ত্রীদের একটু ব্যক্তিত্ব কম থাকলে বিবাহিত জীবন সুখের হয়। মীরাকে সবাই বলে বোকা, কিন্তু মীরা আমার বউ হয়েছে বলে আমি খুব সুখে আছি। কিরে, একলা আমিই যে বকে যাচ্ছি, একটা হাঁ হুঁ দিবি তো!'

—'হ্যাঁ, বিয়ে করাটা দরকার।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সতীন্দ্র।

এখন দুপুর, ঘড়ির দিকে তাকাল সতীন্দ্র। এই সময় পার্বতীকে নিয়ে রেকার পার হবার কথা ছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল সতীন্দ্র। একদল বিদেশী টুরিস্টদের দিকে চোখ পড়ল। স্ত্রী-পুরুষের একটি এরটিক মূর্তির দিকে কেমন লোভীর মত তাকিয়ে আছে। অবশ্য কি এদেশী কি বিদেশী সবাই তাই করে আর এটা তো এক্সপেক্টেড। দেয়ালের একটা জায়গায় দৃষ্টি পড়ল ওর। ছোট্ট করে খোদাই করা—এক চাষা, তার বৌ, মাথায় বোঝা নিয়ে ছোট্ট ছেলের হাত ধরে যাচ্ছে যেন।

—'দেখ সমর এইটে দ্যাখ, কেমন ভাল লাগছে, নারে!' এইবার ওরা এই ধরণের অনেক ছোট ছোট খোদাই করা জিনিস দেখতে শুরু করল। কোথাও একটা লোক হাঁটুতে কনুই রেখে হাতের মুঠির ওপর চিবুক রেখে চিন্তায় মগ্ন। কোথাও শাশুড়ী বৌকে ধরে মারছে। এরকম আরও কত!

—'কত সমস্ত বই লেখে এই মন্দির নিয়ে। এই ছবিগুলোর কথা কোথাও লেখে না রে!' বলল সতীন্দ্র।

—'হয়তো লেখে। আমরা আর কটা বই পড়ি বল।' সমর বলল।

—'তা ঠিক।' চিন্তায় মগ্ন সতীন্দ্র, পার্বতী কি টিকিট পেয়েছে? কি যেন

একটা কথা পার্বতীকে বলতে ইচ্ছে করছে। আমি পেঁছবার আগেই কি বেরিয়ে যাবে পার্বতী ? এই রে, কলকাতার ঠিকানা নেওয়া হয়নি তো !

—'এই দ্যাখ সতীন, এই দিকটার এই রিলিফের কাজটা দ্যাখ।'

—'চল ফেরা যাক।' হঠাৎই বলে উঠল সতীন্দ্র।

—'কি হল ?' অবাক হল সমর।

—'সেই একই রকম সব মূর্তি, একই প্যাটার্ন দেখতে আর ভাল লাগছে না।'

—'হঠাৎ হল কি ?'

—'শরীরটা ভাল লাগছে না, চল।'

—'লাঞ্চটা সেরে যাবি তো, না কি ?'

—খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা গাড়ীতে উঠল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সমর আর না পেরে বলে উঠল—'আমি বুঝতে পারিনি সতীন, পার্থর দেবলীনাকে ভাল লাগে শুনে তোর এতটা খারাপ লাগবে। তুই একটা ছেলেমানুষ !'

—'এক্ষুণি আমি দেবলীনার কথা ভাবছিলাম না।' উত্তর দিল সতীন্দ্র।

—'তবে কি ভাবছিস অমন মুখ গোমরা করে ?'

—'মানুষের মন বড় বিচিত্র !'

—'তুই কি এখন ফিলজফি আওড়াবি নাকি ?'

—'ড্রাইভারটাকে বল না, আর একটু স্পীড দিতে।'

—'মনে হচ্ছে, তুই গিয়েই কলকাতার টিকিট কাটবি ? তুই যে এতটা জেলাস হতে পারিস, তোকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। আমার ধারণা ছিল তুই আমাদের থেকে অন্য রকম।'

—'বাজে বকিসনি, হোটেলে আমার একটা দরকারী কাজ আছে।'

গাড়ি চলেছে। কখনো রাস্তাটা উঁচু হয়েছে, কখনও নীচু। কখনো দুপাশে ফাঁকা মাঠ। কখনো জঙ্গল। কখনো বা গ্রাম, আর কখনো দুপাশের বড় বড় গাছের ডালগুলো মিলে গিয়ে মাথার ওপর খিলান সৃষ্টি করেছে যেন। অন্য সময় সতীন্দ্র এসব লক্ষ্য করত। এ নিয়ে দুটো কথাও বলত, কিন্তু এখন—দেবলীনা কবে চিঠি লিখেছে ? সোমবার। কই, পার্থর বাগানের পিকনিকের কথা তো কিছু লেখেনি ! দোষ কি ? তুমিও তো পার্বতীর কথা কিছু উল্লেখ করোনি ! কিন্তু দেবলীনা সবসময় বলে, সে ফ্র্যাঙ্ক। আমার কোন

প্রিটেনশন নেই। যদি, যদি আজকের টিকিট পেয়ে থাকে পার্বতী তবে দেখা হবে না। নাঃ, কিছুতেই কলকাতার ট্রেন ছাড়বার আগে পৌঁছতে পারবে না ওরা। কলকাতার হাজার হাজার অট্টালিকা, শ' শ' রাস্তা গলি আর লাখ লাখ মানুষের মধ্যে ঠিকানা না জানলে কি কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব! কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দেব তাহলে। একটা কথা পার্বতীকে দেখা হলে বলতেই হবে—'আপনি যা ভাবেন আপনি তা নন। আমি বলছি আপনি দেখতে খুব সুন্দর।' এটুকু বললে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হবে না। গাড়ি ছুটে চলেছে। অন্ধকার হয়ে গেল। আজও চাঁদ উঠবে। কিন্তু একটু দেরি হবে। পার্বতীকে বলতেই হবে,' 'আপনি ডিভোর্স করা মেয়ে বলেই আপনি বাতিল হয়ে যাননি। আপনার সৌন্দর্য পবিত্র। অনেক সুন্দরী আপনার পাশে দাঁড়ালে ম্লান হয়ে যাবে।' আচ্ছা, কি সমস্ত আবোল-তাবোল ভাবছি!

—'একটা সিগারেট দে তো সমর।'

সমর সিগারেট কেসটা এগিয়ে দেয়। পুরী শহরে গাড়ি ঢুকছে, সতীন্দ্রর খেয়াল হল যেন এতক্ষণে।

—'সমর, তোকে তো ভুবনেশ্বর যেতে হবে, তাই না?'

—'ধ্যান ভেঙেছে? হ্যাঁ, তোকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ফিরব।'

—'না, আমাকে তুই এই বাজারের মুখটায় নামিয়ে দে।'

গাড়ি থামল। সমর বলল—'সতীন, তুই এত সেন্টিমেন্টাল ভাবিনি কখনও। তাহলে পার্থর বাগানের কথা তুলতামই না। এই সমাজে এতটুকুর জন্য কেউ এত আঘাত পায় তোকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেল, অনেস্টলি বলছি।'

সতীন্দ্র হাসল। সমরের গাড়ি চলে গেল। সতীন্দ্র দ্রুত এগিয়ে চলল সেই শাড়ির দোকানটির দিকে। সেই মাল্টি-কালার শাড়িটা কিনল সতীন্দ্র। তারপর একটা সাইকেল-রিক্সা ভাড়া করে চলল হোটেলে।

লাউঞ্জে ভীড়। থমথম করছে যেন আবহাওয়াটা।

—'কি হয়েছে?' একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল সতীন্দ্র।

—'একশ দশ নম্বরের মেমসাহেব দুপুরে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। নুলিয়ারা অনেক চেষ্টা করে এক-দেড় ঘণ্টা আগে দেহটা তুলে

এনেছে।'

আরও জানল সতীন্দ্র, ব্রেকার পার হতে গিয়েছিল পার্বতী। দুটো নুলিয়া দেখেছে। খানিকক্ষণ না দেখতে পেয়েই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। মিস সরকারের মাসীর বাড়িতে ট্রাংককল করা হয়েছে। কাল সকালেই ওঁর মা ইত্যাদি এসে যাবেন। পুলিশ এসেছে, মর্গে নিয়ে যাবে দেহ।

একটু আগে পর্যন্ত পার্বতীর ভীতু-ভীতু ভাব কাটিয়ে দিয়েছে বলে সতীন্দ্র গর্ববোধ করছিল মনে মনে, ভেবেছিল সম্পর্ক সহজ হলে বলবে—'ভাগ্যিস আমাদের আলাপ হল, তোমার তাই না খোলসটা ঘুচে গেল। তুমি যে কত সহজ আর স্মার্ট হতে পার তা বোধহয় তুমিও জানতে না, আমিও জানতাম না।'

আর এখন সতীন্দ্রর সারা মনটা হাহাকার করে বলতে লাগল—ভুল হয়ে গেছে, পার্বতী বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আমার কি দরকার বা অধিকার ছিল তোমাকে এইভাবে হনন করবার। আমি দায়ী, তোমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী পার্বতী। মনে পড়ল,—'সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয় পেয়ে পেয়ে এত বড়টা হলেন কি করে?' তুমি ঐ ঢেউ দেখে একটু ভয় পেলে না কেন পার্বতী? তোমার সেই ভীতু-ভীতু নিড়বিড়ে ভাবটা ভাল লেগেছিল বলেই তো তোমাকে ভালবেসেছিলাম পার্বতী। হ্যাঁ, এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তখন তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আসলে এই কথাটাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। এই কথাটাই বলবার দরকার ছিল। খুব দরকার ছিল।

পুলিশের গাড়ী পার্বতীকে নিয়ে চলে গেল। শাড়িটা কোলে নিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রইল সতীন্দ্র। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ আর উদাসীন সমুদ্র গর্জন করে চলেছে সমানে। ঢেউগুলো বালির ওপর আছড়ে পড়ছে—আবার পড়ছে—আবার আবার।

পুরনো গন্ধ

আর ক'দিন পরেই এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এ বাড়ি যত তাড়াতাড়ি হয় ছাড়তেই তো চেয়েছিল সংযুক্তা। তবে? যতই দিন এগিয়ে আসছে ছাড়তে এত কষ্ট হচ্ছে কেন? অথচ যতদিন উইল-এর প্রবেট পেতে, সাকসেশন সারটিফিকেট পেতে দেরি হচ্ছিল—কি হতাশ লাগছিল, মনে হচ্ছিল বাড়িটা বুঝি গিলে খাবে। মাঝে মাঝে রাগে হতাশায় বাবা-মার শোকও ভুলতে বসেছিল সংযুক্তা। চুল খুলতে খুলতে অন্যমনস্ক হল সংযুক্তা। আর কোন রকম যত্নের তোয়াক্কা না রেখেই ঘাসে আবৃত চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়িগুলো আকাশে মুখ তুলে তাকিয়েছে। গেটের কাছে কেয়া ঝোপটার দিকে তাকাল ও। গত বছর প্রায় এই রকম সময়েই মা মারা গিয়েছিল। তার ঠিক এক মাস পরেই বাবা।

না, মা মারা যায়নি—কারা যেন মাকে খুন করেছিল। কারা?

মা রাজনীতি করতেন। খুন হবার ক-দিন আগেই তাড়া-খাওয়া দুটো ছেলেকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন মা। বাড়ির কারুর কথা গ্রাহ্য করেননি। বিপক্ষ পার্টির কিছু ছেলে এজন্যে বাড়িতে এসে শাসিয়েও গিয়েছিল। আর তার ঠিক ক'দিন বাদেই—। খবরের কাগজে ছোট্ট করে খবরটা বেরিয়েছিল—সমাজসেবিকা করবী সিংহের মৃত্যুর কথা। মৃতদেহটা যখন ঐ কেয়া ঝোপের কাছে পড়েছিল তখন ভীড়ের মাঝখানে যারা শাসিয়ে গিয়েছিল তাদের ক'জনকে দেখেছিল সংযুক্তা। কেশব ভূষণ আরো ক'জন। সংযুক্তা কাঁদেনি, কাঁদতে পারেনি। বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সে।

বাবা জীবেশ সিংহেরও সেই অবস্থা। দোতলা থেকে তো তাঁকে নামানই যাচ্ছিল না। অপর্ণামাসী বলেছিল—'করবীর কেউ শত্রু আছে তা ভাবা যায় না।'

মায়ের দেহটা যখন নিয়ে যাবে তখনই শচীকাকা এসে বললেন—'সোনা মা, একবার শেষ বারের মত দেখে নে।' তখনই সংযুক্তা ডুকরে বুক-ফাটানো একটা চীৎকার করে উঠেছিল। 'সোনা'—মা ওকে 'সোনা' বলে ডাকত। কিন্তু বাবা চিরকালই সংযুক্তা বলেই ডাকতেন।

আজ প্রায় এক বছর হতে চলল। খুনী ধরা পড়ল না। অথচ সবাই জানে কারা খুনী। তারা বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে।

মা মারা যাবার দুদিন পরেই বাবার স্ট্রোক হল। তার ঠিক এক মাস পরেই বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

বাবাকে দেখতে আসবার ছুতোয় ভূষণ ওকে ডেকে নিয়ে বলেছিল—'শোন সংযু, জানি আমাদের ওপরেই সন্দেহ হয়েছে তোমাদের, কিন্তু আমরা খুন করিনি। এই সুযোগে আসল খুনী কিন্তু পালাবে।' সংযুক্তা বলেছিল—'আসল কে তা জানো তুমি ?' 'জানলে এতক্ষণ তো—না, জানি না। তবে করবীদির নিজের দলের সঙ্গেও কিছুদিন যাবৎ বনিবনা হচ্ছিল না। তারাও তো হতে পারে। তবে আমার কথা বিশ্বাস করো সংযু, আমাদের দল এর মধ্যে নেই।' সংযুক্তা বিশ্বাস করেছিল। ছোটবেলার কৈশোরের অনেকগুলো ঘটনা স্মরণ করে সংযুক্তা মনে করেছিল, ভূষণ আর যাই করুক কোন কারণেই সংযুক্তাকে মিথ্যা বলবে না। কিন্তু ভাবতে ভাবতে, চুলের জট খুলতে খুলতে সংযুক্তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেছে—ভূষণদের দল ছাড়া আর কেউ মাকে খুন করেনি। শচীকাকারও তো তাই ধারণা। রাস্তায় ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে তাই সংযুক্তার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই। ও বাড়ি বেচে চলে যাবে শুনে ভূষণ যখন দেখা করতে এসেছিল তখন ও বলে পাঠিয়েছিল, 'সময় নেই, দেখা হবে না।' কেবল এইটুকুই করতে পেরেছিল ও।

টেলিফোন বেজে উঠল। সংযুক্তা টেলিফোন ধরে বললে—'হ্যাল্লো, কে ?'

—'আমি রে।'

—'ও, শচীকাকা ? বল, আবার কোন প্রবলেম হয়নি তো ?'

—'না না, প্রবলেম নয়। তোর বাবার লাইব্রেরীর সব বইগুলো একজন

কিনতে চায়, দিবি নাকি ?'

—'হ্যাঁ, মানে,—দিলেই হয়—বাড়িই যখন বিক্রী হয়ে গেল !'

—'জানি জীবেশের বইগুলো বিক্রী করতে তোর খুব খারাপ লাগবে, তবে সোদপুরে মামার বাড়িতে তো এত বই নিয়ে যেতে পারবি না।' সান্ত্বনার সুরে বলেন শচীকাকা, 'আর যে কিনছে, একসময় সে আমাদেরই—মানে আমার জীবেশের আর করবীর ক্লাসমেট ছিল।'

—'তাহলে তো ভালই। বাবার বইগুলোর অযত্ন হবে না অন্তত। তাছাড়া স্কলারশিপ পেয়ে যদি বিদেশেই চলে যাই, তবে তো—সবই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল, না শচীকাকা ?' শেষের দিকে গলাটা কেঁপে যায় সংযুক্তার।

—'শোন শোন, আমি বলি কি যে বইগুলো তোর খুব ভাল লাগে, রাখতে ইচ্ছে করবে সেই রকম কিছু বই বেছে আলাদা করে রাখ। এক আলমারী বই তোর যে কোন জায়গায় ধরে যাবে। দরকার হলে আমার ঘরেও রেখে দেব।'

—'তোমার ঐটুকু ঘরে আর একটা সুটকেসও ধরবে না শচীকাকা।'

—'ধরবে ধরবে, সে ব্যবস্থা করব।'

—'শচীকাকা—'

—'কি হল ? আরে এই, কাঁদছিস নাকি ?'

—'বাড়িটা ছেড়ে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে শচীকাকা।'

—'এ তো খুবই স্বাভাবিক। আমারই কি কম খারাপ লাগছে। করবী জীবেশের স্মৃতি। আমাকে তো এখানেই থাকতে হবে। তবে এই অবস্থায় তুই তো একলা এ বাড়িতে থাকতে পারিস না। তার তালা-চাবি দিয়ে গেলে বেদখল !

—'না না, সে তো ঠিকই, তবে—'

—'জানি জানি, যুক্তি দিয়ে তো সব বোঝা বা বোঝানো যায় না।'

চোখের জল নিঃশব্দে মুছে সংযুক্তা বললে—'শোন, তুমি ওঁকে হ্যাঁ বলে দাও। আমি কিছু বই বেছে একটা আলমারীতে রেখে দিচ্ছি।'

—'কত দাম দেবে জিজ্ঞাসা করলি না ?'

—'কেন ? তুমি জানলেই হবে।'

—'মানুষকে অত বিশ্বাস করা ভাল নয় রে।'

—'মানুষকে তো আর বিশ্বাস করি না। তোমাকে করি।'

—'সর্বনাশ ! আমাকে জানোয়ার-টানোয়ার ভাবিস না তো ?'

—'দেবতা ভাবি বললে বাড়াবাড়ি শোনাবে। তাছাড়া ভগবান-টগবান মানি,

না বেল সহজে কথাগুলো মুখে আসে না। তবে তুমি বোধহয় আলাদা জাতের মানুষ।'

—'ঠিক ঠিক, দেখলি না কেমন নাছোড়বান্দা হয়ে কমপ্লিমেণ্ট আদায় করে নিলাম। যাকগে শোন, ইন্দু মানে আমাদের সেই বন্ধু, দু'হাজার টাকা দেবে বলেছে—প্রায় দেড় হাজার বই-এর জন্য দু'হাজার টাকা কিছুই নয়।'

—'ওই যথেষ্ট। এমনিতে তো বিলিয়ে দিতে হত, না হয় নষ্ট হত। তবু তোমাদের বন্ধু।'

—'না, ইন্দুটা বরাবরই কিপ্টে। যাই হোক, তাই বলছি, তা হলে—'

আরও দু-একটা কথার পর ফোন নামিয়ে রাখল সংযুক্তা। দোতলা থেকে একতলায় লাইব্রেরী কাম বসবার ঘরে ঢুকে দেখল মামাতো বোন ময়না একমনে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছে।

—'ওরে বাবা, এখনও ঐ বই চলছে!'

চমকে তাকিয়ে হেসে ফেলল ময়না।

সংযুক্তা বললে—'বললাম না, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নে।'

—'উঃ সোনাদি, যদি তুমি এই বইটা পড়তে না, নিশ্চয়ই বলছি ছাড়তে পারতে না!'

—'আমি ঐ বই পড়তামই না।' তাচ্ছিল্য করে বলে সংযুক্তা।

—'সত্যি, পিসেমশাই-এর লাইব্রেরীতে এই বই কল্পনাই করা যায় না!'

—'শুনেছি বিয়ের পর মায়ের কিছুদিন খুব সখ হয়েছিল ডিটেকটিভ বই পড়ার। মাকে খুশী করতে বাবা কিনে আনতেন। যাকগে শোন, শচীকাকা ফোন করেছিলেন, একজন সব বইগুলো কিনে নিতে চান। বললেন, পছন্দমত বই বেছে রেখে দিতে। বাকিগুলো উনি নিয়ে যাবেন। তাই তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে এই কাজে হাত লাগাতে হবে।'

—'কে কিনবে?'

—'কে? ঐ বাবা মা শচীকাকার সকলের ক্লাসমেট ছিল। আর 'কে' দিয়ে কি হবে বল, বইগুলো যখন চলে যাচ্ছে—'

—'সত্যি আমাদের বাড়িতেও তো জায়গা নেই, না হলে এখান থেকে সোদপুর আর কতদূর, বল! এগুলো নিয়ে যাওয়া কোন সমস্যাই নয়।'

—'বাবা-মা গেল, বাড়িটা গেল—বই নিয়ে ভেবে আর কি হবে? তবে—'

—'কি তবে?'

—'না, মা মারা যাওয়ার দু-দিনের মধ্যেই তো বাবার স্ট্রোক হল। তারপর জ্ঞান হবার পর জড়িয়ে যেটুকু কথা বলতেন—মনে হ'ত এই লাইব্রেরীতে নিয়ে আসবার কথা বলতেন ও'কে। মানে আমার তাই মনে হত। আর ঘরে মায়ের যে ছবিটা আছে, বারে বারে তাকাতেন সেদিকে। মাঝে মাঝে জল গড়িয়ে পড়ত দু-চোখ বেয়ে।'

—'এই সোনাদি, কাঁদছ নাকি? যা!'

—'না, কোন মানে হয় না তবু যত দিন এগিয়ে আসছে ততই কেমন যেন লাগছে রে।'

—'জানি গো সোনাদি, কতদিনের বাড়ি তোমাদের। তোমার ঠাকুর্দা বাড়িটা কিনেছিলেন, না?'

—'হ্যাঁ, তখন তো মোটে একটা চালাঘর ছিল।'

—'এই বাড়িটা তো ঠাকুর্দা বানিয়েছিলেন। আর বাগানের যত গাছ ঠাকুমা আর ঠাকুর্দা তো মিলে লাগিয়েছিলেন। যাকগে এখন সেণ্টিমেণ্টাল হওয়াটা ঠিক নয়।'

—'তুমি বড্ড বেশী শক্ত মেয়ে। বাবাঃ! যেভাবে একলা এই বাড়িতে থেকে গেলে—আমি হলে ভয়েই মরে যেতাম—দু-দুজন মারা গেল,তার মধ্যে একজনের আবার অপঘাত—'

—'একলা কোথায়, মামীমা তো কতদিন থেকে গেলেন, আর তারপর তো তুই-ই এসে গেলি—' হেসে ফেললে সংযুক্তা, 'নেঃ চল। খিদে পায়নি তোর?'

দুজনে মিলে স্নান-খাওয়া সেরে নিল। কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড রামের মা ছুটি চাইল—সিনেমা যাবে। দোতলায় শোবার ঘরের জানলায় এসে দাঁড়াল দুজনে। গেটের পাশের সেই কেয়া ঝোপটার কাছে একটা কুকুর আর তিনটে বাচ্চা শুয়ে আরামে রোদ পোহাচ্ছে। দুটো বাচ্চা দুধ খাচ্ছে, একটার গা চেটে দিচ্ছে কুকুরটা। ময়না কুকুরটার কাণ্ড দেখে হেসে কুটি-পাটি।

—'ওঃ, মহারাণী কি আনন্দেই রোদ পোহাচ্ছেন! জানিস ঠিক এই জায়গাটাতেই মা খুন হয়েছিল। তখনও এইরকম শীত-পড়-পড় সময়—' বলতে শুরু করে সংযুক্তা, 'খেয়ে উঠলে দুপুরে এমনি শীত-শীত করত—' ময়নার হাসি থেমে গেছে একদম। 'আর দশদিন বাদেই মায়ের মৃত্যুদিন, অথচ আজও খুনী ধরা পড়ল না। পড়বে কি করে? ওদের পিছনে যে বড়

দাদারা আছে। পুলিশের সাধ্য আছে ওদের গায়ে হাত দেয় ?'

ময়না বললে, 'আজ সকাল থেকেই যেন তুমি কেমন হয়ে আছ। সত্যি এ ঘটনা যে এই শহরতলীর কত ঘরে ঘরেই হয়ে গ্যাছে—'

—'হ্যাঁ, এই এরিয়াতেই এ-পার্টি ও-পার্টি করে কম হলেও পাঁচজন খুন হয়েছে। মাকে বলেছিলাম, ছেড়ে দাও ওসব। মাও বলেছিল, ছেড়েই দেব—সকলের সঙ্গে আমার মতেও মিলছে না। কিন্তু জীবনের তিরিশটা বছর তো এই করেই কাটিয়েছি। ছাড়া বললেই কি পারা যায় রে ? বাবাও একদিন মাকে বলেছিল, মিটিংএ অমন উল্টোপাল্টা কথা বোল না, বিপদে পড়বে। মা রেগে বলেছিল, অন্যায় দেখলে আমাকে বলতেই হবে। তার দিন—সাতেকের মধ্যেই তো—!' বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সংযুক্তা।

—'যাকগে ও নিয়ে আর ভেবো না। কিছুই তো আর ফিরবে না। চল চল, বই বাছবে না ?' বলে সংযুক্তার হাত ধরে টানতে থাকে ময়না।

—'দ্যাখ, কল্কে ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে গেছে।'

—'আর দেখেছ কত প্রজাপতি !'

—'কে জানে কারা আসবে ? তারা এই বাগানটা রাখবে না কি করবে।'

—'ধরেই নাও রাখবে না। মাড়োয়ারী কোম্পানী হয় তো ছোটখাটো একটা কারখানা খুলে বসবে।'

—'মা চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, ড্যামথাস, জিনিয়া কত কী লাগাত, এই সময় সব ফুটতে শুরু করত। নাঃ, চল লাইব্রেরীতে চল।'

দুজনে লাইব্রেরীতে এল। কত কত বই। রাজনীতি আর ইতিহাসের বই-ই বেশী। উপন্যাস ইংরাজী-বাংলা মিশিয়ে কম নয়। দর্শন, বিজ্ঞান—কত কত। সংযুক্তা ঠিক করল সবরকম বই-ই কিছু কিছু রাখবে। শেক্সপীয়ার তো ছাড়াই যাবে না। রবীন্দ্রনাথও নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল, মার্কস—পছন্দ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সংযুক্তা—'না দেখে দিয়ে দিলেই হ'ত। কোনটা রাখব আর কোনটা—ওমা ! তুই আবার ঐ ডিটেকটিভ বই নিয়ে বসে গেছিস ?'

—'আর মাত্র চার পাতা বাকি। খুনী ধরা পড়ে গেছে। এখন কেবল গোয়েন্দার ভাষ্যটা বাকী। উঃ সৎমা কিভাবে ছেলেটাকে মারল ! জেলাসী, বুঝলে জেলাসী ! আসলে নিজেরই চোখ ছিল ছেলেটার ওপর।' ময়না আবার ডুবে যায় গল্পের মধ্যে।

সংযুক্তা বলে, 'উঃ, তোর এই এক গোয়েন্দা বই-এর নেশা !'

বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দেয় ময়না—'কলকাতার কফি হাউস, তারপর সেইসব হোটেল ইত্যাদি জায়গায় ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেবার নেশার চাইতে এ নেশা অনেক ভালো। মানে নিরাপদ। নইলে কতবার যে হাসপাতাল যেতে হ'ত।'

সংযুক্তা ধমকে ওঠে, 'এই, ওসব অসভ্য কথা এই লাইব্রেরীতে বসে বলবি না। ওরকম সব হলেই হলো, না?'

—'জানো না তো আমার প্রাণের বন্ধু উজ্জয়িনীর কথা! যদি শুনতে!'

—'থাম। ঐ চার পাতা শেষ করে তাড়াতাড়ি আয়—আমাকে হেল্প কর।'

—'কি যে এক মিশনারী স্কুলে পড়লে, কিছুই শিখলে না।'

—'ওরে বাবা, তুই তাড়াতাড়ি শেষ করে আয় তো, মই দিয়ে ওপরে উঠে ওই বইগুলো নামাতে হবে।'

সংযুক্তা এক একটা বই দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে যায়। ঘরের আলো কমে আসে। আলো জ্বালিয়ে দেয় ও। ময়নাও বইটা বন্ধ করে লাফিয়ে ওঠে, -'ব্যাস, হয়ে গেছে বাবা! কি কাণ্ড! কি অসম্ভব চালাক ঐ সৎমাটা! ভালবাসার জেলাসী যে কোথায় টেনে নিয়ে যায় মানুষকে!'

—'গোয়েন্দা বই পড়ে ঐ জ্ঞান অর্জন না করলেও চলে।'

—'তাহলে বল কি করব?'

—'মইটা একটু চেপে ধর তো। ওপরে উঠে রবীন্দ্র-রচনাবলীগুলো নামাই।'

—'আমি উঠছি, তুমি বরং মইটা চেপে ধর।'

সংযুক্তা মইটা চেপে ধরে। ময়না উঠতে উঠতে বলে, 'তুমি যা নেবে, নেবে। আমি কিন্তু ঐ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টটা নেব।'

—'রাবিশ ডিপার্টমেন্ট বল।'

—'আমার নেশার ডিপার্টমেন্ট—' হেসে বলে ময়না। ওপরে টেলিফোন বেজে ওঠে। ময়না বলে—'এই সোনাদি, মইটা ছেড়ে ওপরে দৌড়িও না যেন।'

—'না, গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া স্বভাব নয় আমার। নাম, তাড়াতাড়ি নাম।'

ময়না দুধাপ নেমে লাফ দেয় মেঝেতে। সংযুক্তা বেসামাল হতে হতে সামলে নেয়। মইটা ফেলে দৌড়য় ফোন ধরতে। ময়না এগিয়ে যায় ডিটেকটিভ বই-এর দিকে। বলে, 'নেশার জিনিসটা আগেভাগে ঠিক করে রাখা ভাল।'

সংযুক্তা ফোন ধরে বলে, 'হ্যালো, শচীকাকা! আবার কী হ'ল? কী?

সত্যি ? কেশরী ? ওরা কেশরীকে ধরেছে ?'

—'হ্যাঁ রে। ওর কাছ থেকে রক্তমাখা জামাকাপড় আর একটা ছোরা পাওয়া গেছে। সব লুকিয়ে রেখেছিল।'

উত্তেজিত হয়ে সংযুক্তা বলে, 'কিরকম ছোরা ? মায়ের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিন্তু বলেছিল ছোরাটা দুদিকেই ধারালো ছিল।'

—'অত কি আর শুনেছি। জানা যাবে আস্তে আস্তে, পুলিশ সন্দেহ করছে ঐ তোর মাকে—'

—'কিন্তু শচীকাকা, এ্যাদ্দিন ধরেও সেগুলো রেখেছিল বোকার মত ?'

—'কি জানি। তখন ওদের রাজত্ব। পুলিশ ওদের কথায় ওঠে বসে—কেয়ার করেনি হয়তো। তারপর ভুলে গেছে ! এখন গণেশ পাল্টেছে—'

—'হ্যাঁ, পুলিশেরও সাহস বেড়েছে—'

—'যাকগে, যদি সত্যি সত্যি ও খুন করে থাকে মাকে তবে ওর শাস্তি হলে আমি খুশী হব।'

—'দু-দিন আগে তুই-ই তো বলতিস ওদের দলের লোকই তোর মাকে খুন করেছে, সে ভূষণ যতই অন্যরকম বলুক।'

—'হ্যাঁ, সে তো সত্যি। কিন্তু এতদিন ধরে প্রমাণগুলো কেন রেখে দেবে—'

—'যাকগে, টেলিফোনে আর অত কথা নাই বা বললি। আমি আসছি।'

ফোন ছেড়ে দিল সংযুক্তা। ভয়ানক উত্তেজিত বোধ করছে ও। যদি ওর মাকেও না খুন করে থাকে, কেশরী কাউকে-না-কাউকে তো খুন করেছে। সে তো ওরা করতেই পারে। বুক ফুলিয়ে নিজেরাই তো এ ধরণের কত কথা বলেছে। যা হবার হবে। মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করল সংযুক্তা। এইবার একবার ভূষণকে সামনে পেলে হয়। একতলায় এসে রান্নাঘরের দিকে গেল ও। একটু চা খেতে হবে। ময়নাটাও অনেকক্ষণ চা খায়নি। স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়ে লাইব্রেরীতে এল সংযুক্তা। বললে, 'ওরে ময়না, খুব তো ডিটেকটিভ বই পড়িস, কেশরী ধরা পড়েছে মাকে খুনের দায়ে ! কি করে এটা এখন প্রমাণ করা যায় বল তো ?—কি হয়েছে, অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? হাতে ওগুলো কি ?'

ময়নার চোখমুখ কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ওর হাতে একটা চাদর,—বিবর্ণ, ছোপ ধরা। তার সঙ্গে একটা ছোরা আর চিঠি। ময়নার হাত থেকে জিনিসগুলো নিল সংযুক্তা। ভ্যাপসা বিশ্রী একটা গন্ধ বেরুচ্ছে।

ছোরাটার দু'দিকই ধারালো। ময়না কোনমতে হাত দিয়ে একটা জায়গা দেখালো। ডিটেকটিভ বইগুলো ছিল ওখানে, আর ঠিক তারই পিছনে ছিল এই জিনিসগুলো। সংযুক্তা বই-এর পিছনে হাত দিয়ে বার করে আনল একটা বিবর্ণ পাঞ্জাবি আর ধুতি। এই কাজ-করা-পাঞ্জাবিটা সংযুক্তাই সখ করে কিনে দিয়েছিল বাবাকে। পাওয়া যাচ্ছিল না এটা। চিঠিটা পড়ল সংযুক্তা। মা লিখেছিল শচীকাকাকে—

'শচী,

ও তোমাকে আর আমাকে নিয়ে কুৎসিত সন্দেহ করছে। কলেজ-জীবনে কবে সেই যে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, এতদিন বাদে সেই কথা তুলে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। পার্টিতেও আমার নিষ্ঠা নিয়ে যে সমস্ত কথা উঠেছে, জেনো তার মূলে তোমার বন্ধু জীবেশ সিংহ। অন্য অনেক কথা তো জানই। আমি আর পারছি না। সোনার বিয়ে হয়ে গেলে বাঁচতাম। তাহলে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতাম। এ মেয়ে কারুর প্রেমেও পড়ে না! হ্যাঁ, কাল জীবেশ বলল, "অত স্পষ্ট কথা বললে পার্টি নাকি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে!" ও যে কি ভাবে আর কি বলে কিছু বুঝতে পারি না। দেখা হলে এত কথা তো বলা যায় না। তাই চিঠিটা তোমার ঘরে ফেলে দেব।

ইতি কবি।'

পুনঃ—'ওর সঙ্গে তুমি একটু কথা বলবে, ও কি চায়—জানবে একটু?'

চুপ করে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইল।

লাইব্রেরীতে ঘড়িটার শব্দ বড্ড জোরে শোনা যাচ্ছে।

ঝাপসা আলোয়
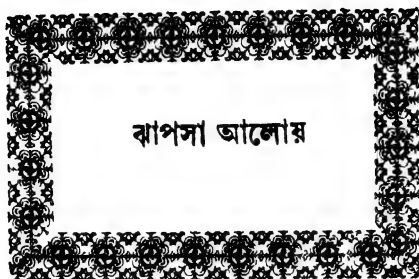
শতদলবাসিনী অসুস্থ। তাঁর ছেলে যতীন্দ্র ডাক্তার ডাকতে গেছে। বিধবা কন্যা বসে বসে হাওয়া করছে। লোডশেডিং। অতি বৃদ্ধা. চুরাশী বছর বয়স্কা শতদলবাসিনী ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—'একটু জল।'

প্রায়ান্ধ, প্রায় বৃদ্ধা বাণী চমকে উঠে বলল, 'জল দেবো ?'

চোখে ছানি পড়ার পর থেকে বাণী প্রায়ই এরকম অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কি যে আকাশ-পাতাল ভাবে। মোমবাতির পাশে রাখা জলের গ্লাসটা আনতে গেল। কিন্তু ঠিকমত ঠাওর করতে না পারায় পড়ে গেল জলের গ্লাস। কাঁসার গ্লাস, তাই ভাঙল না। এ গ্লাসেই প্রায় ষাট বছর জল খেয়ে আসছেন শতদলবাসিনী। অপরাধী গলায় বাণী বললে, 'পড়ে গেল মা। দাঁড়াও রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসি।' অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে গেলাস খোঁজে বাণী।

শতদলবাসিনী আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'থাক মা, শেষে নিজেই পড়ে মরবি।'

তবু বাণী হাতড়ে হাতড়ে গ্লাসটা খোঁজে আর ভাবে, 'ছিঃ ছিঃ, আমি জলটা ফেলে দিলাম!' বাণীর কাছাকাছি কিছু এলোমেলো ঘটলে বাণী সব সময় নিজেকেই দোষ দেয়। সেই সুন্দরী বলে যখন বাণীর বিয়ে হয়ে গেল, তখন 'সুন্দরী' বলে নিজেকে দুষেছিল বাণী। সুন্দরী না হলে তো বিয়েটা হত না। তারপর থেকেই কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে বাণীর, কোন এলোমেলো ঘটনায় নিজেকে দোষী করবে!

দরজায় কড়া নাড়ল কে। গেলাস খোঁজা রেখে বাণী চলল দরজার

দিকে হাতড়ে হাতড়ে। আবার কড়া নড়ে উঠল, বাণী বলল, 'যা—ই।' দরজা খুলল। ডাক্তার মজুমদারকে নিয়ে ঢুকল যতীন্দ্র।

—'এ কি রে ছোড়দি, একটামাত্র ছোট্ট মোমবাতি জেবলে রেখেছিস? জানিস তো ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসব। লণ্ঠনটা জবালতে পারিসনি?'

চৌষট্টি টাকা ফিজের ডাক্তারের সামনে হাজার টাকা মাইনের কেরানী যতীন্দ্র বড় বিব্রত বোধ করছে। বাণী লজ্জিতভাবে কি একটা বলতে যায়, তারপর হাতড়ে হাতড়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে চেষ্টা করে।

ডাক্তার একটু তাকিয়ে থেকে বলেন, 'উনি চোখে দেখতে পান না?'

যতীন তাড়াতাড়ি বলে, 'না, দুটো চোখেই ছানি পড়েছে, কাটাতে হবে। মানে সবদিক ম্যানেজ করে উঠতে পারছি না স্যার,—থাক তোকে যেতে হবে না ছোড়দি, আমিই আনছি।'

দুটো ঘরের ফ্ল্যাটের ড্রইংরুম নামক ঘরটিতেই শতদলবাসিনী আর তাঁর কন্যা থাকেন। ডাক্তার এগিয়ে যান ক্ষীণদেহী রোগিণীর দিকে। একটা চেয়ার নিজেই টেনে নিয়ে বসেন, বাণী ভাবে তারই তো চেয়ারটা এগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। একটু এগিয়ে গিয়ে আর একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়ায়। যদি ডাক্তার কোন ফরমাস করেন!

যতীন্দ্র আরো দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তার দেখলেন রোগিণীকে। বুড়ো বয়সের রোগ। বয়স, ম্যালনিউট্রিশন, চিকিৎসার অবহেলা। নাঃ, আর বেশী দিন নেই। বাঙালীর এই স্বভাব। মৃত্যু কাছে না এলে বড় ডাক্তার ডাকবে না। তবু ওষুধ দিতে হয়। আর আজকাল কতই না দামী দামী ওষুধ বেরিয়েছে।

প্রেসক্রিপশন লিখতে গিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার যতীন্দ্রকে।

যতীন নার্ভাস হয়ে বলল, 'শতদলবাসিনী—মানে শতদলবাসিনী মৈত্র।'

ডাক্তারের উদ্যত কলম থেমে যায়। প্রথম থেকেই বৃদ্ধার মুখ দেখে কেমন যেন লাগছিল—এই কি সুরেশ মৈত্রর স্ত্রী? ভদ্রলোক ঐ প্রায়ান্ধ ধুতি পরা মহিলাকে ছোড়দি বলল না? তবে এই কি—? ডাক্তার তাকালেন বাণীর দিকে। —হ্যাঁ, বাণীই তো! এরাই রাজসাহীর সেই সুরেশ মৈত্রর পরিবার? এই বাণীর টানেই পাবনা থেকে ছুটে যেতেন বিজয়েন্দ্র মজুমদার—রাজসাহীর স্কুল-মাস্টার তাঁর বাবার বাল্যবন্ধু সুরেশ মৈত্রর বাড়িতে। বুড়ো বয়সে আবেগ নাকি অনেক কমে যায়। কিন্তু এ কি! ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গেল নাকি? একচল্লিশ সালের

পর এই দেখা। প্রায় চল্লিশ বছর পর পরিচয় দেবার ইচ্ছেটাকে অতিকষ্টে দমন করলেন বিজয়েন্দ্র। কিন্তু পরিচয় নেবার ইচ্ছে, নিশ্চিত হবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠছে যে! সাবধানে ডাক্তার বললেন, 'ও'র চোখের ছানি কতদিনের?'

যতীন বলে, 'তা অনেকদিন হোল।'

—'হুঁ।' খস্‌খস্‌ করে শতদলবাসিনীর প্রেসক্রিপশন লেখেন ডাক্তার। তারপর যতীনের দিকে ফিরে বলেন, 'ও'কেও দেখিয়ে নিন না। আমি লিখে দিচ্ছি, আপনাদের এই কাছের পলিক্লিনিকে চলে যাবেন। খুব একটা খরচ লাগবে না।'

আই-স্পেশালিস্ট ডাঃ সেনের নামে চিঠি লেখেন ডাঃ মজুমদার। মোমবাতির আলোয় আবার তাকান বাণীর দিকে। ভুরুর ওপরের সেই জরুলটা বয়স উপেক্ষা করে অথবা বয়সের জন্য আরও স্পষ্ট হয়েছে কি? চিঠি লেখা শেষ করে ডাক্তার বলেন, 'এক গ্লাস জল খাবো।'

বাণীরই তো উচিত জল এনে দেওয়া। বাণী আবার যেতে যায়।

যতীন এতক্ষণে লক্ষ্য করে মেঝেতে জল, বলে—'এ কি, গ্লাসটা পড়ে গেল কি করে?'

বাণী লজ্জিত হয়ে বলে, 'আমার হাত লেগে, মা তখন জল খেতে চেয়েছিল।'

যতীন গ্লাসটা তুলে নিয়ে চলে যায় জল আনতে।

ডাক্তার বলেন, 'বাড়িতে আর কেউ নেই?'

বাণী বিব্রত বোধ করে মিনমিনে গলায় বলে, "নাঃ, বৌ, মানে ভাই-বৌ ছেলেকে নিয়ে ওর বাপের বাড়ি গেছে।'

—'এই অবস্থায় আপনাদের রেখে?'

বাণী বলে—"নাঃ, ওর শরীরও তো ভাল না।'

শতদলবাসিনী কি বলে ওঠেন। ডাক্তার ঝুঁকে পড়েন তাঁর দিকে, 'কিছু বলছেন?'

কাঁপা গলায় বলেন বৃদ্ধা, 'না বাবা, আমার ওপর রাগ করে চলে গেছে—তুমি আমাকে আর ওষুধ দিও না। নাড়ুর ওপর আর কত চাপ দেব—?' হাঁফাতে থাকেন তিনি।

ঠিক তো, এই প্রৌঢ় লোকটির—সেদিনের সেই ছ' বছরের ছেলেটির ডাকনাম নাড়ুই ছিল তো। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনে সারা উঠোন-ভর্তি আলপনার ধারে চাঁদের আলোর নীচে বিজয়ের কোল ঘেঁষে বসে এই প্রৌঢ়—সেই ছেলেটিই

তো গল্প না শুনে ছাড়ত না সেদিন। শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসতো বাতাসে। সতের বছরের বাণী, আর তার এক বছরের বড় টুনি, আর নাড়ু বসে গল্প শুনতো। রোমিও জুলিয়েট, টুয়েলভ্থ্ নাইট—আরও কত গল্প নাড়ুকে শোনাবার ছলে বাণীকেই কি শোনাত না বিজয় ? কি করে কোন্ পথ বেয়ে এরা আজ এই টালিগঞ্জের এই ফ্ল্যাট বাড়িতে এসে পে'ছিল ? বাণী বিধবা হল কবে ?

নাঃ, আর কৌতূহল প্রকাশ করলে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। হলো বা! নাঃ, কি দরকার ? না হওয়াই তো ভাল। চল্লিশ বছর—দুস্তর দুর্বিনীত ব্যবধান।

হাঁফ একটু কমলে শতদলবাসিনী বলে চলেন, 'আমি না মরলে বৌ আসবে না বলে গেছে—'

—'আঃ, মা কি হচ্ছে ?' বলে ওঠে বাণী।

মনে মনে বলে, বৌ ঠিকই বলে, 'মা'র ভীমরতি ধরেছে।'

যতীন ডাক্তারের জন্য কাচের গ্লাসে আর মায়ের জন্য কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে আসে। জল খেয়ে ডাক্তার উঠে পড়েন। আলো জ্বলে ওঠে। যতীন ফিজ্ নিয়ে এগিয়ে যায়।

কি মনে করে ডাক্তার বলেন, 'না, থাক।' উজ্জ্বল আলোতে আর একবার বাণীর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে যান। ডাক্তারের ব্যাগ গাড়িতে তুলে দিতে সঙ্গে যায় যতীন। মনে মনে ভাবে, ছোড়দির চোখ দেখাতে পারিনি বলে কি ডাক্তার করুণা করল ? আবার টাকাটা বেঁচে গেল বলে কোথায় একটা স্বস্তিবোধও করতে লাগল।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে রাজসাহার সুরেশ মৈত্র যখন প্রথম মেয়ে দুর্গার বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, তারই কিছুদিন পর তাঁর মেজ মেয়ে টুনি ওরফে মণিকা পালিয়ে গেল একটি মুসলমান ছেলের সঙ্গে। ঢাকায় এখনও ইসলাম ডাক্তারের খুবই খ্যাতি। কিছুদিন আগে বোধহয় এসেও ছিলেন কলকাতায় কি একটা মেডিক্যাল কনফারেন্সে। তাঁর স্ত্রী মণিকা ইসলাম সমাজসেবিকা—কিছু দিন আগে মারা গেলে সে খবর ঢাকার কাগজে ছোট করে বেরিয়েও ছিল। মেডিক্যাল কলেজে ইসলাম বিজয়ের দু'বছরের সিনিয়র ছিল। টুনির জন্য সমাজে মুখ দেখাতে পারেননি সুরেশবাবু। বিদ্রূপের কশাঘাতে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল। কি নিষ্ঠুরই না হতে পারে এই সমাজ !

রায়সাহেব গজেন ভাদুড়ী বাড়ি বয়ে এসে বলেছিলেন, 'কি সুরেশবাবু,

আপনার ছোটমেয়েটি তো বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছে। বিয়ে দেবেন নাকি? আমার হাতে একটি ভাল খৃষ্টান পাত্র আছে!' বলেই কেমন দুলে দুলে হেসেছিলেন তিনি।

সুরেশবাবু আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, পারেননি। পারেননি ঐ শতদল-বাসিনীর জন্যই। ঠিক মুহূর্তে কোথা থেকে এসে তিনি হাত থেকে দড়ি কেড়ে নিয়েছিলেন। তারপর দুজনে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

শিউলি গাছের নীচে গভীর রাতে পেঁচা ডেকে উঠেছিল। টুনির খবর পাবনায় বিজয়দের বাড়িতেও পেঁছেছিল। বিজয় তখন কলকাতায়। বাবা অম্বুজ মজুমদার চিঠি লিখে সাবধান করে দিয়েছিলেন ছেলেকে। তাঁর আদেশ, বিজয় যেন সুরেশ মৈত্রর বাড়িতে আর না যায়। তারা বলতে গেলে জাতিচ্যুত হয়ে গেছে। চল্লিশ বছর আগে এরকম [illegible] অমান্য করবার শক্তি অনেকেরই ছিল না। তাই এক মাস সময় লেগেছিল বিজয়ের মনস্থির করতে। তারপর শতদলবাসিনীকে চিঠি লিখেছিল—'খুড়িমা, বাণীর বিয়ের জন্যে ভাববেন না, আমাকে ডাক্তারীটা পাশ করতে দিন—।'

কিন্তু অঘটনটা তার আগেই ঘটে গিয়েছিল। ফরিদপুরের সেই বেঁটে-খাটো বাপের বয়সী ছোট জমিদারটি নীলমণি গোস্বামী সুন্দরী বাণীকে তাঁর চতুর্থ পক্ষের বৌ করে নিয়ে সুরেশবাবুকে জাতে তুলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বাণী শ্বশুরবাড়ি রওনা হবার পরদিন বিজয়ের চিঠি এসে পেঁছেছিল। ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন শতদলবাসিনী। দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি এসে চিঠির কথা কেমন করে যেন জানতে পারে বাণী। পাগলের মত খুঁজেছিল চিঠিটা। মা বলেছিলেন, 'তোর বাবা ছিঁড়ে ফেলেছে।' একথা গল্প-কাহিনীর মত জানা ছিল যতীনের। আর সুরেশবাবু জাত রক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে বছরখানেকের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন। শ্রাদ্ধ করতে খুব অসুবিধা হয়নি। নীলমণি গোস্বামী ভাল করে শ্রাদ্ধ করবার জন্য টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাণীকে আসতে দেননি। মেজদি মণিকা ইসলামের গোপন টাকা পাঠানোতে চলতে লাগল শতদলবাসিনীর খাওয়া-পরা, চলতে লাগল নাড়ুর স্কুল। এরও বছর দু'য়েক পরে হাজার দুই টাকা আর সামান্য কিছু গয়না সঙ্গে নিয়ে বিধবা হয়ে বাণী ফিরে এসেছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালো ছায়ায় আর কালো টাকায় ভারতবর্ষ টলমল। তারপর দেশভাগ, স্বাধীনতা। বাণীরা জানল রাজসাহী তাদের দেশ নয়, বিদেশ। পালাতে হবে। অতএব কলকাতা।

ডাক্তারের টাকা না নেওয়াতে যতীন কোথায় অপমানিত বোধ করছে। ফিরে এসে বিরক্ত হয়ে বললে, 'খাবার কিছু আছে ছোড়দি ?'

বাণী অন্যমনস্কের মত বলে, 'কি নাম রে ডাক্তারের ?'

যতীন বলে, 'ডাঃ মজুমদার।'

—'না, বলছি পুরো নাম কি ?'

—'কি জানি, চেম্বারের দরজায় লেখা আছে ডাঃ বি মজুমদার। ওতেই বিখ্যাত। চৌষট্টি টাকা ফি। দে খেতে দে—'

বাণী বলে, 'আচ্ছা মা, বিজয়দাও তো ডাক্তারী পড়ত না ?'

মা বলেন, 'তখন তো শুনেছিলাম, ছেড়ে দিয়েছিল পড়াশোনা।'

ঠিকই শুনেছিলেন তিনি। দু'বছর বিজয় দেশভ্রমণ করে বেড়িয়েছিল।

এর এক মাস পরে শতদলবাসিনী মারা গেলেন। মাঝে যতীন আর একবার গিয়েছিল ডাঃ বি মজুমদারের কাছে, তিনি আসেননি। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একজন জুনিয়ার ডাক্তারকে। যতীনের বৌ মঞ্জুলা ফিরে এসেছিল শতদলবাসিনী মারা যাবার দু'দিন আগেই। কিছুদিন পর যতীন মায়ের তোরঙ্গটা ঝাড়াঝাড়ি করল। পুরোনো দিনের দু'একটা টাকা-আধুলি সিঁদুর-মাখানো। দু'তিনখানি পাঁচালীর বই-এর সঙ্গে বেরিয়ে এল সযত্নে ফিতে দিয়ে বাঁধা বেশ খানকয়েক চিঠি। সুরেশ মৈত্র যৌবনে লিখেছিলেন শতদলবাসিনীকে। পড়তে পড়তে যতীন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। না পারে ভাল করে মনে করতে শতদলবাসিনীর সধবা চেহারাটা, না পারে মনে আনতে সুরেশ মৈত্রর চেহারাটা। ঐ সময়টা যতীনের কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই চিঠিগুলোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে বিজয়ের সেই চিঠি।...'খুড়িমা, বাণীর বিয়ের জন্যে ভাববেন না'...নববিবাহিত ছোড়দি পাগলের মত এই চিঠিই খুঁজেছিল। এ চিঠিরও কোন অর্থ নেই আজ কারও কাছে, ভাবে যতীন।

অনেক অপ্রয়োজনীয় কাগজ দিয়ে যায় মঞ্জুলা বাণীকে উনুন ধরাবার জন্য। আবছা চোখে ঠাওর করে করে বাণী উনুন ধরায়। অনেক কাগজের সঙ্গে বিজয়ের চিঠিটাও গুঁজে দেয় উনুনে। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে। ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তবু কি ভাবে বাণী। ধোঁয়ায় চোখ দিয়ে জল পড়ে। তারপর এসে যতীনকে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ রে নাড়ু, এবার আমার ছানিটা কাটাবি তো ?'

বদল

রত্নেশ্বর রায়। রঙ্গপীঠ নাটমঞ্চের পরিচালক অভিনেতা। কলকাতা শহরে ঠিক তক্ষুনি ভিড় ভেঙে পড়ছে রঙ্গপীঠ-এর রত্নেশ্বরকে দেখার জন্যে। একটি বহু পুরনো নাটককে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। রঙ্গপীঠের পড়তি দশা এখন তাই উঠতির দিকে। মঞ্চ-মালিক নীলকণ্ঠ বাজ তাই আহ্লাদে গদগদ। ভাগ্যে নীলকণ্ঠের মাথায় নাটকটা, আর রত্নেশ্বরের কথা একসঙ্গে এসেছিল। আজ পাঁচশ নাইটে নীলকণ্ঠ ঠিক করেছেন সবাইকে ভাল ভাল সব পুরস্কার দেবেন। সকাল থেকেই মঞ্চের সামনে মাইক দিয়ে সানাই বাজানো হচ্ছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক রত্নেশ্বরের বাল্যবন্ধু বিজিতেন্দ্র চৌধুরী প্রধান অতিথি হতে স্বীকার করেছেন।

সময়ের একটু আগেই বিজিতেন্দ্র এলেন রত্নেশ্বরের সাজঘরে। রত্নেশ্বরও কেশবিন্যাস শেষ করে বিজিতেন্দ্ররই অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম সম্ভাষণের পর দু'একটা কথা হবার পরই বিজিতেন্দ্র বলে বসলেন, 'বেড়ে আছিস রত্ন, সেজেগুজে খোকা হিরো হয়ে দিব্যি সব অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে লাভ সিন করে যাচ্ছিস, আর—'

বিজিতেন্দ্রর কথা ফুরুতে-না-ফুরুতে রত্নেশ্বর যেন ক্ষেপে উঠলেন, 'দেখ বিজে আমি কেবল লাভ সিন করি, তোর মত ঐ কচি মেয়েগুলোকে নিয়ে গুরু সেজে—'

—'আরে আরে, তুই হঠাৎ ক্ষেপে উঠলি কেন? ঠাট্টা বুঝিস না?' বিস্মিত বিজিতেন্দ্র বলেন।

—'খুব বুঝি, খুব বুঝি ! হ্যাঁ, ঘরে বাইরে স্বস্তি নেই কোথাও ! কোন, স্ত্রীর ভ্রাতা বলতে পারবে না যে রত্নেশ্বর রায় কোথাও কোন—'

বাধা দিয়ে বিজিতেন্দ্র বলেন, 'বুঝেছি স্ত্রীর ভ্রাতারা বলতে পারেন না, বলেন না। কিন্তু স্ত্রীদের জিহ্বা যদি একবার লকলক করে ওঠে তবে পরিত্রাণ নেই !'

রত্নেশ্বর হঠাৎ হেসে ফেলেন, 'স্ত্রীর ভ্রাতা তোকে নিয়ে আর পারা গেল না—ধরেছিস ঠিক।'

—'আরে বাবা, আমারও তো একটা ঘর বলে বস্তু আছে না কি ? আর সেখানে একগাছা স্ত্রীও আছে। জিহ্বা নামক হুলটি তারও কিছু কম নয়। সত্যি বলছি, তোকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। কে বলবে সাতচল্লিশ বছর বয়স হয়েছে তোর ! আর আমার দ্যাখ—'

রত্নেশ্বরের মনে হয়, তাঁরও কিছু বলা উচিত। বলেন, 'কেন বাবা, চুলে কলপ লাগিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবিটা পরে, ঝকঝকে দাঁতে চকচকে টাকে—'

—'দাঁত ?' বিজিতেন্দ্র হো হো করে হেসে ওঠেন, 'আরে ভেজাল ভেজাল, এভরিহোয়্যার। তোর উইগটার মত আমার ওপরের চারটি আর নীচের এই সামনের তিনটি—'

—'বাঁধানো ? আশ্চর্য, একেবারে বোঝবার উপায় নেই ! দাঁত বাধালে মুখের শেপটা অন্যরকম হয়ে যায় না ? কিন্তু তোকে—'

—'আরে কোন মান্ধাতার আমলে পড়ে আছিস তুই ! আজকাল এমন সব হয়েছে না—এমন করে বাঁধিয়ে দেবে না, তোর বৌ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না যে তুই দাঁত বাঁধিয়ে এসেছিস। তোর দরকার হলে বলিস, নিয়ে যাব ডাঃ রক্ষিতের কাছে।'

—'যেদিন দাঁত বাঁধাতে হবে ছেড়ে দেব সব—'

—'ইল্লিশ !' পান মুখে দিতে দিতে বলেন বিজিতেন্দ্র, 'তখনই দেখবি নয়া নয়া হিরো করবার ইচ্ছে হবে, দেখ আমাকে এখনো কেমন দেখায়— ।'

—'যাকগে, তারপর এখন কি লিখছিস ?'

—'আমার 'ট্রেনের হুইসল' পড়িসনি ?

—'না রে, মানে সময় হয়ে ওঠেনি।'

—'তা বটে। কেবল বস্তাপচা সব নাটক করবি, আর সেইগুলো পড়বি। ভাল

জিনিস পড়বার সময় কোথায় তোর!' বোঝা যায়, বিজিতেন্দ্রর আশা ছিল 'ট্রেনের হুইসল' রত্ন পড়েছে। সারা পশ্চিমবাংলায় যা সাড়া জাগিয়েছে, কেন পড়েনি রত্ন সেটা? ভেতরে একটা রাগ জমে উঠল। একটু ব্যঙ্গ করে বললেন বিজিত, 'ঐ কর, বস্তাপচা নাটকে অভিনয় কর আর সেইগুলো নিয়ে জাবর কাট। দুনিয়াটা যে এগিয়ে যাচ্ছে সে খেয়ালও বোধহয় তোর নেই। বাহান্ন সালেও গোবিন্দলাল সেজেছিস, পঁচাত্তর সালেও গোবিন্দলাল। বৃহস্পতি, শনি, রবি—খালি জাবর কাটছিস। এত নাম করেছিস, কোথায় তোরা মঞ্চটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবি—ধুর—ধুর—' অদ্ভুত অবজ্ঞা প্রকাশ করেন বিজিত।

—'এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তো তোরাই রয়েছিস—রয়েইছিস তো। কেবলমাত্র তোদের মত লোকের হাতে যদি বাংলার সংস্কৃতি নির্ভর করত—'

বাধা দিয়ে বলেন রত্ন, 'তবে সংস্কৃতি রসাতলে যেত। তবে তোকে একটা কথা বলি, সাহিত্যের নামে তুই যেমন ভণ্ডামী করিস, অভিনয়ের নামে আমি তেমন করিনে—'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সাবধানী তুই। সব বাঁচিয়ে-বুচিয়ে টাকার পাহাড় করে চলেছিস।'

—'হিংসের কি আছে? তুইও তো সেই পথে পা বাড়িয়েছিস।' এবার শ্লেষে জর্জরিত রত্নর কণ্ঠ।

—'হ্যাঁ, বাড়িয়েছি আলবৎ, তবে গা বাঁচিয়ে নয়। তোর মত ঐ ভালমানুষ থেকে নয়। ছাত্র আন্দোলন করেছি, জেলে গেছি। দেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। তাই আজ যা পাচ্ছি সেটা আমার দেশের দান!' গর্বিত মনে হয় বিজিতকে।

—'ওঃ, তুমি টাকা পেলে সেটা দেশের দান, আর আমি পেলে দেশের দান হল না কেন?'

—'কারণ আমি যেটা লিখি সেটা আমার অনেকদিনের সাফারিং-এর অভিজ্ঞতা। তাতে থাকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সত্যিকারের চেহারা। সমাজের অন্যায় পঙ্কিলতা সবার সামনে খুলে ধরবার চেষ্টা। একটা মূল্যায়ন। আর তুই যেটা করিস—তা হল লোকের মন ভোলানো। সেজন্য তোকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়নি। তাই বছরের পর বছর ধরে ঐ এক টাইপের নায়কের চরিত্র ছাড়া কিছু করতে পারলি না। ভগবান চেহারাটা দিয়েছিল, গলাখানা দিয়েছিল। মুখে রঙ চড়িয়ে ভাল ভাল পোশাক পরে গলা খেলিয়ে মেয়েদের

কাঁদিয়ে কেবল ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আর বেনামী বাড়ি-গাড়ি—।'

রত্নেশ্বর ক্ষোভে বিস্ময়ে গলা চড়িয়ে বলেন, 'তুই বলতে চাস আজকের আমি যে তৈরী হয়েছি তার কোন ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই, কোন পরিশ্রম নেই? সাধনা নেই?'

—'ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। পরিশ্রম আছে খানিকটা। কিন্তু সাধনা? নো, নেভার।' দৃঢ় কণ্ঠস্বর বিজিতেন্দ্রর।

—'মানে তুই বলতে চাস—'

রত্নকে থামিয়ে বিজিত বলেন, 'আমি বলতে চাই, সত্যিকারের শিল্পী হতে গেলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তা তুই তো ঐ একমাত্র—'

বলতেই রত্ন চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'দিস ইজ গোয়িং টুব ফার! রাজনীতিকে তুই পণ্য করে সাহিত্য করেছিস, তাই আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। বন্যাত্রাণের জন্য আমি চ্যারিটি শো করিনি? আর. পি. হাসপাতালে একটা পুরো ওয়ার্ড আমার টাকায়—'

একটা শান্ত ভাব দেখিয়ে বিজিত বলেন, 'রাগ করিসনি, রত্ন। বন্যাত্রাণের জন্য ঐ শোটা যদি তুই না করতিস, তোর নিজের বদনাম হোত। তোর নিজের নামের মোহে তুই করেছিস। আর হাসপাতালের ঐ ওয়ার্ডটা তোর বাবার নামে হয়েছে। সেখানেও নাম বংশ এসব নিয়ে অহংকারের প্রশ্ন আসে। গায়ে আঁচটি লাগল না, ত্যাগ করলাম, সে ত্যাগের কোন মূল্যই নেই। তা যদি করতে পারতিস তো দেখতিস সেটাও কম বড় শ্লাঘার বস্তু নয়। তার আনন্দ—'

—'তুই জানিস? করেছিস কখনো?'

—'বললাম না, নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জিনিস না হলে তা নিয়ে লিখি না বা লেকচার দিই না।'

যতক্ষণ বিজিতেন্দ্র কথা বলছিলেন, মনের উপর দিয়ে অনেক ছবি ভেসে যাচ্ছিল রত্নেশ্বরের। তেইশ বছর বয়সে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থার রত্নেশ্বর প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন বাড়িওয়ালার একমাত্র মেয়ে সোনালী দত্তকে। আজ সেই বিরাট বাড়ির মালিক সোনালী ওরফে রত্নেশ্বর। পঞ্চাশ সালের হিন্দু-মুসলমান রায়টের সময় পাড়ার বুড়ো মুসলমান দর্জি জব্বর যখন হন্যে হয়ে আশ্রয়ের জন্য ঢুকে পড়েছিল তাদের একতলার বাড়িতে, বাবার হার্টের অসুখের অছিলায় তাকে রাস্তায় বার করে দিতে এতটুকু সঙ্কোচ হয়নি তার। এই তো সেদিন জেঠতুতো দাদার ছেলে সমর যখন একটা চাকরির জন্য রেকমেণ্ডেশন লেটার,

চাইতে এসেছিল, দেননি রত্নেশ্বর। কারণ সমর এক বিশেষ রাজনীতির জন্যে বাহাত্তর সাল থেকে চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত জেলে ছিল।—মনটাকে অনেক কষ্টে টেনে এনে বিজিতের সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'শুনিই না বিজে যে কি ত্যাগ করে এত আনন্দ পেলি? অনেক ছোট তো করলি আমাকে, আর একটু না হয় হব, তবু শুনি!'

বিজিতেন্দ্র যেন সম্বিৎ ফিরে পান। ছি ছিঃ, এ কি অধঃপতন হয়েছে তাঁর। এ কি অহংকার? পদ্মপুকুর স্কুলের সেই রোগা ফর্সা বড় বড় চোখের নিরীহ ছেলে রত্ন। অঙ্কের মাস্টার ভুজঙ্গবাবুর বেত যখন লিকলিক করে উঠত, তখন বিজিতের যে প্রায় কান্না পেত। আর আজ? সময় কি একটা সাংঘাতিক জিনিস। মানুষকে কি রকম নষ্ট করে দেয়। সাধে কি বার্ণার্ড শ বলেছেন —'আফটার ফরটি, এভরিম্যান ইজ এ স্কাউণ্ড্রেল'। দুজনেই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলেন। দরজার বাইরে রিনটিন শব্দ উঠল। মিষ্টি কণ্ঠে শোনা গেল, 'রত্নদা আসব?' বেঁচে গেলেন রত্নেশ্বর।

—'আরে এস এস, তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দিই।'

ভ্রমরবেশিনী কৃষ্ণা করকে দেখে বিজিতেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। আলাপ করিয়ে দিতেই কলকণ্ঠে বলে ওঠে কৃষ্ণা, 'আপনি বিজিতেন্দ্র চৌধুরী! শুনেছিলাম আপনি প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন, তবে,—ওঃ, স্বপ্নেও ভাবিনি আপনাকে এত কাছ থেকে দেখতে পাব। আপনার একটু পায়ের ধুলো দিন।' পিছনে সরবার জায়গা নেই। পায়ের ধুলো দিতে হল।

—'রত্নদা, আপনার সঙ্গে আলাপ আছে? কই বলেননি তো কোনদিন?'

—'আমরা স্কুলের বন্ধু।' কোনমতে বলেন রত্নেশ্বর।

কৃষ্ণা বলে চলে, 'জানেন বিজিতেন্দ্রবাবু, আমি আপনার একজন অন্ধ ভক্ত। আপনার 'ট্রেনের হুইসল' যখন 'দেশের মাটি' কাগজে বের হচ্ছিল তখন থেকেই আমার পড়া। ওঃ, কি যে লিখেছেন। দেশের মানুষের খাঁটি কথাটি একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। শম্পার, আপনার নায়িকার কথা অনেক ভেবেছি। আচ্ছা ওর আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না, না? কিন্তু গ্লোরিয়াস, আমিনুল্লাকে কিভাবে বাঁচাল—উঃ, ভাবা যায় না। আচ্ছা শম্পাকে আপনি দেখেছেন? না মনগড়া একটি মেয়ের জীবনে এত কিছু ঘটে একসঙ্গে?'

বাধা দিয়ে রত্নেশ্বর বলেন, 'না ঘটতে পারে, তবে বিজিত যা দেখে না জানে

না তা লেখে না।' বিজিতেন্দ্রর মনে হল রত্নর কথায় বিদ্রূপ আছে। সত্যি, শম্পা চরিত্র একটু বাড়িয়ে লিখেছেন বৈকি! মেয়েটা ধরেছে ঠিক। অনেক নারীর অনেক কথাই তো শম্পাতে সন্নিবিষ্ট। কি বলবেন কথা খুঁজে পান না বিজিত।

নীলকণ্ঠ কলকণ্ঠে প্রবেশ করে সমস্যার সমাধান করে দেন।—'এই যে স্যার, আপনি এখানে আর আমি—। রত্ন তো আপনার ক্লাসমেট, এখানেই তো থাকবেন আপনি—আশ্চর্য! পল্টুদা এসে গেছেন, চলুন স্টেজে।'

স্পষ্ট বোঝা যায় পল্টুদা কে বোঝেনি বিজিত। রত্নেশ্বর বলেন, 'এক সময়ের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় নিত্যানন্দ বসু—আজকের সভাপতি। নিজের সাবজেক্টের বাইরে কোন খবর তো রাখবি না!'

এখানেও কি একটা খোঁচা দিল রত্ন? বিজিত ভাবলেন। নীলকণ্ঠ বলে ওঠেন, 'ওঁর ডাকনাম পল্টু, আমরা সবাই পল্টুদাই বলি।'

—'সে তো বটেই, সে তো বটেই।' বলেন বিজিত। বোঝেন কোন মানেই হল না কথাটার।

মঞ্চে বক্তৃতা চলে। সাজঘরে বসে বসে ভাবেন রত্নেশ্বর। এতবড় কথা বলল বিজে!—নাঃ, এর একটা উচিত জবাব দিতেই হবে। আমি যদি বাবার নামের জন্য হাসপাতালে টাকা দিয়ে থাকি, তবে তুই-ই বা কেন নিজে নাম কেনবার জন্য জেলে গিয়েছিলিস। ভেবেই বুঝতে পারলেন, দুটো জিনিস এক হোল না। আচ্ছা, আমার যদি রাজনীতি ভাল না লাগে আমি ফালতু হয়ে যাব? বিজে অবশ্য রাজনীতির কথা বলেনি। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল সোনালীর ওপর। আজকাল এমন ব্যবহার করছে ও! লাস্ট মোমেণ্টে বলল, আজ আসবে না। অথচ নীলকণ্ঠবাবু নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। সোজা বলে দিল, 'তোমার ঢং দেখতে আর যেতে ইচ্ছে করে না।' রত্নেশ্বর বলেছিলেন, 'ঢং? আমার অভিনয় তোমার ঢং বলে মনে হয়?' ঝেঁজে বলল সোনালী, 'তাছাড়া আবার কি? এক নায়িকায় ঠেকানো শক্ত, এ নাটকে আবার দুটো।' 'কি আশ্চর্য, বইটা দুবছর চলছে, এতদিন তো মনে হয়নি?' সোনালী ব্যঙ্গে বলল, 'পুরোনো ভ্রমরকে তাড়িয়ে এই ভ্রমরকে আনা হল কেন শুনি?' 'শ্যামলীর এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয়েছে।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই কৃষ্ণা করকেই আনতেই হল!' 'কাউকে না কাউকে তো আনতেই হবে। তাছাড়া যেই আসুক, আমার তাতে কি আসে যায়?' 'খুব এসে যায়, ডুবে ডুবে জল খাওয়া—বুঝি না? লাভ

সিন-এর ভোল পাল্টে গেছে, ভ্রমরকে আদরের ঘটা বেড়েছে।' 'কে তোমাকে এসব কথা বলল ?' 'থাক থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না। যে ভাগাড়ে যাচ্ছ যাও। যত ইচ্ছে ঐসব করে এস—' সময় হয়ে গিয়েছিল। চলে আসতে হল। না হলে—। নাঃ, সোনালীর সঙ্গে তর্ক করে পারা যায় না। আজকাল সোনালী নতুন তাল তুলেছে, 'অনেক টাকা হয়েছে—যেসব কারবারে টাকা লাগানো হয়েছে সেখান থেকে টাকা আসছে। টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে অত ভাড়ার টাকা আসছে, আবার কি দরকার এসব করবার ?' যেন কেবল টাকা রোজগারের জন্যেই তিনি অভিনয় করেন ! অভিনয় জিনিসটা যে কি সোনালীর মোটা মাথায় ঢুকবে ?

চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। কৃষ্ণার সঙ্গে আরও ক'জন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, 'আপনাকে প্রাইজ নিতে ডাকছে আর আপনি'—টানতে টানতে নিয়ে চলে কৃষ্ণা রত্নেশ্বরকে। মঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করতেই হাততালিতে ভেঙে পড়ে প্রেক্ষা-গৃহ। মুক্তো বসানো সোনার বোতামের বাক্স হাতে নিয়ে দর্শকদের দিকে ফিরে নমস্কার করতে গিয়ে তৃতীয় সারির মাঝের রাস্তার পাশের চেয়ারে একজনকে দেখে চমকে ওঠেন রত্নেশ্বর। সে-ই না ? রত্নেশ্বরকে দেখতে এসেছে ? আচ্ছা সে-ই যে, তা কি জোর করে বলা যায়। বলা যায় ? ঐ কালো রং। ঐ কোঁকড়া চুলে যে চুল বাড়ে না, বেঁটে দুটো বেণী দু'পাশে ঝোলানো। মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, তাছাড়া বাঁ বাহুতে রুপোর চেন-এ রুপোর তাবিজ। বলতো, 'ওসব লুকোন-ছুকোন আমি পছন্দ করি না। গুরুদেব পরতে বলেছেন পরবো।' 'কি হবে ওতে ?' উত্তরে মুচকি হেসে বলত, 'বিয়ের ফুল ফুটবে।' ওটা অবশ্য মিথ্যে কথা। কিন্তু আজও বিয়ে হয়নি মেয়েটার ?

বক্তৃতা শেষ। প্রাইজ দেওয়া শেষ। মঞ্চের পর্দা পড়ে গেল। বিজিতেন্দ্র এসে রত্নেশ্বরের হাত ঝাঁকিয়ে বলেন, 'কিছু মনে করিসনি রত্ন, তখন বড্ড বেশী এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'আরে না না, আমি কি ছেলেমানুষ নাকি ?'

—'নাঃ, আমিই ছেলেমানুষি। করলাম শোন, আজ তোর অভিনয় দেখতে পাচ্ছি না। একটা জরুরী কাজ আছে।'

বাধা দিয়ে রত্নেশ্বর বলেন, 'বুঝি রে বুঝি, এইসব বস্তাপচা জিনিস দেখতে তোর ভাল লাগে না। তবে আমার মুখ রাখতে প্রধান অতিথি হতে স্বীকার হয়েছিলি এই যথেষ্ট। তোকে তো তার জন্য ধন্যবাদই দেওয়া হল না।'

হৃদ্যতার মধ্যেই বিজিতেন্দ্র বিদায় নিলেন। রত্নেশ্বর এগিয়ে যান পর্দার দিকে। একাধিক ফুটো আছে পর্দাটায়। একটা ফুটো রত্নেশ্বরই একটু বড় করে নিয়েছিলেন টেনে টেনে। সেই ফুটোর মধ্যে দিয়ে দর্শকদের দেখেন তিনি। এটা তাঁর একটা হবি বলতে পারা যায়। পর্দাটা টেনে নিয়ে নিপুণভাবে চোখ লাগালেন তিনি।—নাঃ, কোন ভুল নেই। এ সে-ই। আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে পড়াতে আসত খুকুকে। খুকুর তখন আট বছর বয়স। ইংরেজী মিডিয়ামে দিতে হবে বলে তাড়াতাড়ি দরকার পড়েছিল ভাল ইংরেজী জানা একজন টিচারের। সোনালীর দূর-সম্পর্কের মাসীর মেয়ে, কনভেণ্টে পড়া পৃথা দাশগুপ্ত। ডাকনাম পাখী। তাই এসেছিল। পাখীর সযত্ন চেষ্টাতেই খুকু অতবড় স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিল। সবটাই পৃথার কৃতিত্ব। আর একটা কৃতিত্ব, রত্নেশ্বরের জীবনে ঢেউ তোলা।—কি আশ্চর্য, খুব বদলায়নি তো! কিন্তু পাশের লোকটা? কি বিশ্রী অসভ্য দেখতে! কি বিশ্রীভাবে একটা ঠেলা দিল পাখীকে! কে লোকটা? পাখীর স্বামী? পাখী কি তবে বিয়ে করেছে? করলে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার সেটা। কিন্তু কই, ওর মাথায় সিঁদুর দেখা যাচ্ছে না তো? নিজের চশমাটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিলেন তিনি। তবু সিঁদুর দেখা গেল না। হয়তো বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, এখনো হয় নি। পেছনে কাঁধের ওপর কে হাত রাখল। ফিরে দেখলেন কৃষ্ণা। 'উঃ, রত্নদার এই বদ অভ্যাস আর গেল না! খুব লোক হয়েছে, না? শুনলাম অনেক একস্ট্রা সিট পড়েছে। সরুন না, আমি একটু দেখি।' অন্য সময় হলে একটা কোন রসিকতা করতেন হয়তো। কিন্তু এখন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সরে গেলেন। স্টেজ ম্যানেজার সুবিমল এসে বলল, 'দাদা, সেকেণ্ড বেল হয়ে গেছে। এই কৃষ্ণা, যাও যাও, অনেক হয়েছে। স্টেজ ফাঁকা, গেট আউট বলছি।' কৃষ্ণা জিব কেটে পালিয়ে যায় ভিতরে। রত্নেশ্বর দ্রুত গিয়ে আবার ফুটোয় চোখ রাখেন। এ কি! কোথায় গেল পাখী? যেন কি হারিয়ে ফেলেছেন! ওঃ নাঃ, আসন বদল করেছে। ঐ লোকটা আইলের ধারের সিটটায় বসেছে। পাখীর বাঁদিকে আর একটা লোক বসেছে। বয়স কম। দুজনের সঙ্গেই কি পাখী ফষ্টিনষ্টি করছে?' একেবারে গোল্লায় গেছে দেখছি। ওরকম চোখ নাচিয়ে কি বলছে পাখী ওদের? 'দাদা, থার্ড বেল দেব কি? এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। পেছন থেকে সুবিমলের মৃদু অথচ দৃঢ় কথাগুলি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রত্নেশ্বরকে।

প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার করে অভিনয় শুরু হল। মঞ্চের আলোতে সামনের কয়েকটা সারি সামান্য আলোকিত। রত্নেশ্বরের চোখ কেবলি তৃতীয় সারির সেই জায়গায় চলে যাচ্ছে, যেখানে উনি মনে করছেন পাখী বসে আছে। ঠিকই মনে করছেন। আট বছর এমন কিছু বেশী দিনের কথা তো নয়। তাছাড়া ও যে পাখী। একটা দৃশ্যের শেষে কৃষ্ণা অনুরোধ করল, 'আজ আপনি এত অন্যমনস্ক কেন রত্নদা ? এই সিনটায় আমার নাকটা টেনে নিয়ে বলবার কথা— 'আমার কালো ভোমরা"—আপনি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন। নাকটা টানলেনই ন। দেখবেন পরের সিনটায় ভুল করলে কিন্তু হাততালি আর উঠবে না।' ষ্ণা দৌড়ে চলে যায়। ওর ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে। সাজঘরে এসে রত্নেশ্বর াবেন, সুবিমলকে বলবেন নাকি তৃতীয় সারির দু'বেণী করা কালো মেয়েটাকে নটারভ্যাল এ ডেকে আনতে ? কিন্তু ওর সঙ্গীরা কি ভাববে ? নাঃ, সঙ্গীরা নিশ্চয়ই সিগারেট খেতে বাইরে চলে যাবে। কিন্তু পাখী যদি না আসে ? সাজ-ঘরের এখানে ওখানে প্রত্যেকটি লোক কৌতূহলী হয়ে উঠবে। রহস্যের সন্ধান করতে চাইবে। আর রত্নেশ্বর কি বলবেন ? কেমন আছ পাখী ? আমার কথা মনে পড়ে তোমার ? কেমন অকওয়ার্ড হবে না! তারপর যেমন করে হোক সোনালীর কানে উঠবেই কথাটা। আর সোনালী বুঝতেই পারবে, কাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। থাক থাক। রত্নেশ্বরের সচ্চরিত্র বলে নাম আছে, সে নামটারই বা—। বিজিতের কণ্ঠ শুনতে পান রত্ন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, যা করেছিস নিজের নাম নিজের বংশের নামের জন্য করেছিস। মানে রত্নেশ্বরের সব ভাল কাজের পেছনেই একটা মতলব আছে ? নিস্তরঙ্গ মন আর হৃদয় নামে বস্তু দুটিতে কি যেন একটা নাড়া দিয়ে গেল। এ বসন্ত বাতাসের মৃদুমন্দ বিলম্বিত লয়ের নিয়মিত দোলা নয়। যেন বৈশাখের ঘূর্ণি হাওয়ার ধুলোর মধ্যে দমবন্ধ হবার অবস্থা। ইচ্ছে হচ্ছে দৌড়ে এই আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু যাচ্ছেন না। ইনটারভ্যালে পাখীকে ডেকে আনতে বলবেন সুবিমলকে ? চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল সুবিমলের ডাকে, 'কি করছেন দাদা, আপনার কিউ এসে গেছে—' দৌড়ে মঞ্চে প্রবেশ করবার আগে কোনমতে সুবিমলকে বলে যান, 'ইনটারভ্যাল হলেই আমার কাছে এস তো একবার!'

যথাসময়ে বিরতি হল। মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসতেই নীলকণ্ঠবাবু এগিয়ে এলেন, 'রত্ন, কাকে নিয়ে এসেছি দেখ!' নীলকণ্ঠের পেছনে দাঁড়িয়ে সোনালী। মৃদু মৃদু হাসছে।—'যখনই শুনলাম উনি আসবেন না বলেছেন, মনে ভাবলাম,

সে কি হয়? প্লে শুরু হতেই গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, একেবারে ধরে নিয়ে এসেছি। পাঁচশ নাইটের উৎসব বলে কথা!' রত্নেশ্বরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বলেন, 'কিন্তু ভাই, ইনটারভ্যালে হাততালিটা উঠল না কেন?—যাকগে যাকগে, আমি জানি লাস্ট সিন-এ তুমি পুষিয়ে দেবে।' ওঁর সতর্ক করবার ধরনই এমন।—'ওরে সুবিমল, কাটলেট চপ কিছু বলেছিস নাকি?'

সোনালী বলে, 'ওসব কিছু লাগবে না নীলকণ্ঠদা, আমি চাইনীজ নিয়ে এসেছি। আমি তো জানতামই আমি আসবই। আপনি না গেলেও এ সময় আমি ঠিকই এসে পড়তাম।'

ঘূর্ণি হাওয়াটা বড্ড জোর হল। ধুলোয় রত্নেশ্বরের চোখমুখ ভরে যাচ্ছে সোনালীর পেছন পেছন সাজঘরে ঢুকলেন রত্নেশ্বর। চাইনীজটা খেতে খেতে সব ভেঙে গেল। সত্যি, সোনালী যে কতবার রং স্টেপিং থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে সোনালীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন তিনি, 'কি, রাগ পড়ল!' সোনালী হেসে বলে, 'আহা, ঢং!'

সুবিমল এসে বলে, 'ইনটারভ্যালে দেখা করতে বলেছিলেন, দাদা!'

—'তোমার বৌদিকে একটা ফোন করবার জন্য বলতাম, তা—'

—'বাঁচিয়েছেন বৌদি, টেলিফোনের যা অবস্থা,—তাহলে যাই দাদা, ফার্স্ট বেল দেবার সময় হল—' সুবিমল যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত চলে যায়।

কৃষ্ণা এবং আরও অন্য অভিনেত্রীরা এসে সোনালীর পায়ের ধুলো নেয়। সোনালী হেসে বলে, 'কি, শুনলাম খুব ভাল ভাল প্রাইজ পেলে সবাই! তা তোমাদের বই চলছে বটে!'

কৃষ্ণা যেন গলে গিয়ে বলে, 'সবই তো দাদার জন্য।' সোনালী খুশী হয়। কে না জানে রত্নেশ্বরের ইন্‌সপিরেশন সোনালী!

সোনালী চলে যায় দর্শকদের জায়গায়। রত্নেশ্বর প্রমাদ গণেন, তৃতীয় সারিতে বসে আছে পাখী। তবে তিনি তো আর পাখীকে আসতে বলেননি। নাটক দেখতে কে আসছে না আসছে তা তাঁর জানবার কথা নয়। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হবার একটু আগে আবার পর্দার ফুটোয় চোখ রাখেন রত্নেশ্বর, সোনালী বসেছে একেবারে সামনের সারিতে। পিছু ফিরে দেখছে কত লোক তার স্বামীকে দেখতে এসেছে। সোনালীর ভাবনা স্পষ্ট বুঝতে পারেন রত্নেশ্বর। কিন্তু কই, পাখী বা তার সঙ্গীদের তো দেখা যাচ্ছে না! সেকেণ্ড বেল হয়ে গেছে। হুড় হুড় করে দর্শকরা যে যার জায়গায় বসছে। কই, পাখীরা আসছে না কেন?

কী এত চা-টা খাচ্ছে রে বাবা! উদ্বেগ বোধ করছেন তিনি। এবারও সুবিমল এসে বলে, 'দাদা থার্ড বেল দেব?'

অভিনয়ের মাঝে মাঝেই তৃতীয় সারির সেই আসনগুলোর দিকে দৃষ্টি চলে যায়। আবছা আলোতে বুঝতে পারেন, আসনগুলো খালিই পড়ে আছে। একসময় নাটক শেষ হয়। ঝিরঝির করে বৃষ্টি নেমেছে। মেঘ ডাকছে। বাড়ি যাবার তাড়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চের বাইরে এবং ভেতরে সব ফাঁকা হয়ে গেল।

রত্নেশ্বর নিজেই ড্রাইভ করছেন। পাশে বসে সোনালী। গম্ভীর। সাজঘরে যে হাসির ঝিলিক দেখা দিয়েছিল কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। বাড়ি এসে অভ্যাস-মত সব টুকিটাকি সেরে দুজনে খেতে বসলেন। রত্নেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুকুর খাওয়া হয়ে গেছে?' আশা করেছিলেন খুকু এসে তাঁর প্রাইজটা দেখতে চাইবে। যেমন প্রত্যেকবার চায়। গাম্ভীর্য বজায় রেখে সোনালী বলল, 'সীমার সঙ্গে ছবি দেখতে গেছে। আজ ওখানেই থাকবে।'

সীমা রত্নর বোনের মেয়ে।— সীমাই না হয় আমাদের বাড়িতে আসত। তাই বললেই তো পারতে!' সোনালীর সঙ্গে একা ভাল লাগছে না।

সোনালী কথার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। রামের মা খাবার গরম করে সামনে রাখল। রত্নেশ্বর বললেন, 'বাঃ, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, মুরগী, পটলভাজা, এটা কি? ছেঁচকি—' বলতে বলতেই রামের মা একথালা ফুলকো লুচি নিয়ে এল। রত্নেশ্বর বললেন, 'সত্যি সোনালী, তোমার তুলনা হয় না।'

তবু সোনালীর কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। প্রমাদ গুণলেন রত্নেশ্বর। খানিক পরে সোনালী বলল, 'তুমি কাউকে নেমন্তন্ন করেছিলে নাকি নাটক দেখার জন্যে?'

—'আমি? নাঃ।'

—'ওঃ. তাহলে হয়তো দেখতে ভুল হয়েছে।'

ভয়ে কাঁটা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রত্নেশ্বর, 'কেন, কাকে দেখলে?'

—'নাঃ, আমারই ভুল হবে। লবিতে পাশ থেকে হঠাৎ মনে হল—নাঃ, আমারই ভুল হবে।' হয়তো রত্নেশ্বরের মন থেকে মুছে গেছে পাখীর স্মৃতি। ঐ নামটা উচ্চারণ করে সেটাকে নাড়া দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত কাজ হবে না। ভাবল সোনালী।

রাত গভীর হল। সোনালী ঘুমুচ্ছে। রত্নেশ্বর ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। মেঘ কেটে গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে।—পৃথা, পাখী স্কুলে চাকরি করে টিউশানি করে সংসার চালাত। যখন খুকুকে পড়াতে শুরু করল, চার মাসের মধ্যেই ছোট বোন টুকির বিয়ে হল। মা অন্ধ হয়ে গেল। অনেকদিন থেকেই চোখের অসুখে ভুগছিলেন। একটা চোখ আগেই গিয়েছিল। দ্বিতীয় চোখটা ছানি কাটার পর হেঁচকি তুলতে গিয়ে। এমনও হয়। তখন পাখীকে দেখে বড্ড মায়া হত রত্নেশ্বরের। সেই সময় সোনালীই একদিন এসে বলেছিল, 'শোন, পাখী দু'হাজার টাকা ধার চাইছে। টুকির বিয়েতে বেচারীর অনেক ধার হয়ে গেছে। তারপর মানুমাসীর এই অবস্থা, কি করা যায় বল তো?'

অভ্যাসমত বলেছিলেন তিনি, 'তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। আমি কি বলব?' সোনালী তাই করে, তবু জিজ্ঞাসা করতে হয়।

'আমি বলি কি, দিয়েই দিই। এখনও তো দু'বছর খুকুকে পড়াতে লাগবে। একশ টাকা মাইনে। তা মাসে পঞ্চাশ করে কাটলেই হবে। তাহলে ধার তোমার শোধ হতে লাগবে ধর—নাঃ, দু'বছরে অবশ্য শোধ হবে না—'

—'তোমার যখন ইচ্ছে তখন দিয়েই দাও না। সে তখন দেখা যাবে।' তাড়াতাড়ি বলেন রত্নেশ্বর। এ বাড়িতে আলমারী ভর্তি টাকা থাকে।

—'সেই ভাল, কালই তো নতুন ছবিটার জন্যে দশ হাজার দিয়ে গেছে।'

সেই সময় এমনই এক ঝিরঝিরে বৃষ্টির রাতে টালিগঞ্জ থেকে ফিরছিলেন তিনি। রাত ন'টা হবে তখন। ট্রাম বন্ধ। বাসও বিরল। রাসবিহারীর মোড়ে অনেক লোকের মধ্যে বাসের জন্যে পাখীকে হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করতে দেখেছিলেন, গাড়ি থামিয়ে পাখীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্টেশন রোড ছাড়িয়ে একটা গলির মধ্যে ওর ফ্ল্যাটে। পাখী বসতে বলেছিল। অন্ধ মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন ভিজে কাপড় পাল্টে সাধারণ একটা শাড়ী সাধারণ করে পরে ভিজে চুলে, চল্লিশ পাওয়ারের বাল্বের আলোতে চায়ের পেয়ালা হাতে এসে দাঁড়িয়েছিল, অপরূপ লাগছিল ওকে দেখতে। অনেকদিন পর মোহের স্বাদ পেয়েছিলেন রত্নেশ্বর।

কত কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। পাখীর মায়ের একটা ওষুধ দরকার, পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। ওষুধ যোগাড় করে রাত সাড়ে ন'টার পর পাখীদের বাড়িতে পৌঁছতে গেছেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন, ঐ সময় পাখী বাড়ি থাকবেই। —পাখীর কলকণ্ঠে তার স্কুলের কথা, ট্রামবাসের ভীড়ে মেয়েদের অসুবিধের

কথা, বন্ধকী দোকান বা পুরোন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড শাড়ী কোথায় কিনতে পাওয়া যায়. এমন কত কথা শুনতে শুনতে রাত সাড়ে দশটা বেজে যেত কতদিন। উঠতে ইচ্ছে করত না। তবু উঠতে হত। পাখী বুঝে নিয়েছিল সোনালীকে একথা বলা যাবে না। ঝঞ্ঝাট হবে। পাখী বলেনি কোনদিন।

রত্নেশ্বরের ভাল লেগেছিল, মেয়েটার কপটতা নেই। 'পুরোন কাপড়ের দোকান থেকে একশ টাকা দামের শাড়ী কুড়ি টাকায় কিনে পরে কেমন চাল মেরে বেড়াচ্ছে!' হি হি করে হাসতে হাসতে সে কথা বলতে একটুও সংকোচ হত না মেয়েটার। কত কথাই জেনেছিলেন তিনি। বাবার ইচ্ছে ছিল, ইংরেজী শিখিয়ে নানা গুণে ভূষিত করে দারুণভাবে তৈরী করবেন পাখীকে। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। পাখীর ষোল বছর বয়সের প্রেম কেমন করে বাইশ বছর ছুঁতে-না-ছুঁতে রুদ্ধশ্বাসে মৃত হয়েছিল। বাবার বন্ধু উপকারের ছলে কি সুবিধে নিতে চেয়েছিল। ভীড়ের বাস থেকে পড়ে গিয়ে কেমন করে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল। তারপর বঁটিতে হাত কেটে গেলে পর স্কুলের কলিগ ঊষাদি এক তান্ত্রিক গুরুর কাছে গিয়ে এ মাদুলী করিয়ে এনে দিয়েছিল। প্রথমদিন অবশ্য মুচকি হেসে বলেছিল, 'পরেছি তাড়াতাড়ি বিয়ের ফুল ফুটবে বলে।' আর একদিন বলেছিল, 'কি করে আর ফুটবে? যার সঙ্গে বিয়ে হলে ভাল হত তার যে বিয়ে হয়ে গেছে।' বুঝতে পেরেও রত্নেশ্বর বলেছিলেন, 'সে কে? বল না, তার ডিভোর্স করিয়ে ছেড়ে দেব।' চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল পাখীর। 'সত্যি পারবেন?' পাখীর গলার স্বরে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পাখীর মনের জোর অসম্ভব। কিন্তু তাঁর? লুকিয়েচুরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকেই তিনি কিছু করতে পারেন, তার বেশী নয়। পাখীকে ভালবেসেছিলেন তিনি, পথ খোলা থাকলে হয়তো—। কে জানে। পাখীকে উনি উপহার দিতেন। পাখী তা নিত। বলত, 'আমাকে ভালবেসে কেউ কখনো কিছু দেয়নি, তুমি দিচ্ছ। ফিরিয়ে দেব এত শক্তি আমার নেই।' রত্নেশ্বর বড় ভদ্র, বেশীদূর এগোননি। একদিন, মাত্র একদিন মনে হয়েছিল পাখী যেন নিষিদ্ধ কিছু চাইছে তাঁর কাছে, সেদিনও এমনি ঝিরঝিরে বৃষ্টি ছিল। পাখীদের পাশের ঘর থেকে বসবার ঘরে এসে ফিসফিসে গলায় বলেছিল ও, 'মা ঘুমিয়ে পড়েছে।' রত্নেশ্বর বুঝতে পেরেও নিজেকে জয় করেছিলেন।—আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি নেমেছে। সামনের পার্কের গাছগুলো ঝাপসা লাগছে। একটু একটু বৃষ্টির ছাঁট এসে তাঁর গায়েও লাগছে। ব্যালকনির চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি।—

সেদিন বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। গাড়িতে ওঠবার আগেই বেশ ভিজে গিয়েছিলেন। পরদিন খুকুকে পড়াতে এসে এক ফাঁকে বলেছিল পাখী, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, কাল আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।' আর সেই ভিজে চেহারা দেখেই সোনালীর কেমন সন্দেহ হয়েছিল—'নাঃ, ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। খবর নিতে হবে।' তারপর পাখীর অপমান। সোনালী যখন নিতান্ত বস্তির ভাষায় অপমান করে পাখীকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, খুকু কাঁদছিল। আর পাশের ঘরে স্থাণুর মত বসেছিলেন তিনি। সিগারেট নিভিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। কি মনে করে নাটক দেখতে এসেছিল পাখী? নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে। কিন্তু সঙ্গের লোকদুটো কারা? তার তো বিশেষ বন্ধুবান্ধব ছিল না কোনদিন। আবিষ্কারের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল, পাখী তো কোনদিন লিপস্টিক কাজল এসব দিত না! কিন্তু আজ সেসব ছিল। শাড়ীর রং-ও কি রকম লাউড ছিল না? পাখী কি বদলে গেছে? পেছন থেকে সোনালী বলে, 'কি ব্যাপার, কিসের ধ্যান করা হচ্ছে?' হেসে বলেন রত্নেশ্বর, 'রিভাইভ্যালের পর এই নাটকটা এত রান করবে কে ভেবেছিল? তবে ভাবছি কি জান, সত্যিই সব ছেড়ে দিলেই হয়। সেই একই ধরনের হিরো সাজা আর ভাল লাগে না, আর এই বয়সে মানায়ও না।' 'খুব মানায়। আজ যা দেখাচ্ছিল, বাবা, তবে সামলে চলো, তোমার হিরোইনরা আবার না—এই জানো, কতক-গুলো ছেলে না আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছিল—রত্নেশ্বরের বৌ!' খুঁক খুঁক করে হেসে ওঠে সোনালী। 'তাই নাকি?' যেন খুব খুশি। হয়েছেন রত্নেশ্বর। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবেন রত্নেশ্বর, বিজে কি পাখীদের নিয়ে গল্প লেখে? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজে সোনালীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

দিন-দুই পর সকালে চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে গিয়ে এক জায়গায় এসে দৃষ্টি থেমে গেল তাঁর। পুলিশ থেকে একটা মেয়ের ছবি ছাপিয়েছে: নীচে লিখেছে। 'বৃহস্পতিবার সকালে একলা চা খেতে দেখা গিয়েছিল। প্রায়ই একাই ঐ দোকানে চা খেতে আসত। না, দোকানের মালিকের মেয়েটির পরিচয় জানা নেই। রং কালো, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি হাইট। কোঁকড়া চুলে দুপাশে দুটো বেণী। কানে মাকড়ী। বাম বাহুতে রুপোর তাবিজ। পরনে লাল হলদে ছাপা নাইলনের শাড়ী। শুক্রবার সকালে অমুক ব্রীজের কাছে গলার নলি কাটা অবস্থায় পুলিশ তার মৃতদেহ পায়। সঙ্গে কোন ভ্যানিটি ব্যাগ বা কিছু পাওয়া যায়নি। যদি কেউ মেয়েটির—ইত্যাদি।'

কিছুক্ষণ নড়তে পারলেন না রত্নেশ্বর। কি করবেন এখন তিনি? চির-কালের সাবধানী রত্নেশ্বর চেপে যাবেন ব্যাপারটা? কেউ তো আর জানে না যে পাখীকে তিনি দেখেছিলেন। ভাগ্যে ইনটারভ্যালে সোনালী এসে পড়েছিল। সোনালী যে কতবার বাঁচিয়েছে তাঁকে। কিন্তু এমন লাগছে কেন? এ কি, চোখে জল আসছে কেন? সঙ্গের লোক দুটোকে স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। ওরাই নিশ্চয়ই খুন করেছে পাখীকে। তিনি যদি লালবাজারে গিয়ে বলেন—। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—কিন্তু পুলিশের জেরায় সবই তো বেরিয়ে পড়বে। তাঁর সঙ্গে পাখীর পরিচয় ইত্যাদি। প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে মামলার বিবরণ বেরুবে। আর সোনালী?—'ওঃ, তাহলে তুমিই ওকে নেমন্তন্ন করেছিলে?' বলবেই সোনালী, আবার চেয়ারে বসে পড়েন তিনি। তাঁর পাখীকে দেখাটা নিতান্তই এ্যাকসিডেণ্ট। নাঃ, এ বয়সে আবেগের ছেলেমানুষি তাঁর পোষায় না। তবু অস্থির লাগে। একটা দায় অনুভব করছেন কোথায়। হঠাৎ মনে হল পাখী যেন বলছে, 'কিগো জামাইবাবু, মর্গে পচেই মরব নাকি?'

আচ্ছা. ভুলও তো হতে পারে। হয়তো পাখী নয়। ওদের বাড়ি একবার গেলে হয় না? রত্নেশ্বরকে সাহায্য করবার জন্যই যেন ঝেঁপে বৃষ্টি এল। এ্যামবাসাডার না নিয়ে ছোট অস্টিনটা নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন। অনেক অ—নে—ক দিন পর আবার পাখীদের ফ্ল্যাটের কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া এল, 'কে?' গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না রত্নেশ্বরের। আবার কড়া নাড়লেন তিনি। পাশের ফ্ল্যাটের দিকে তাকালেন। নাঃ, তাঁকে দেখে ফেলবার ভয় নেই। বৃষ্টি, অস্টিন, পাশের ফ্ল্যাটে তালা। স্বস্তিবোধ করলেন। আবার কড়া নাড়লেন। এবারে শুনলেন পাখীর মায়ের গলা।—'পাখী, পাখী এলি? আবার চাবি হারিয়েছিস? দাঁড়া খুলি। কি যে করিস মাঝে মাঝে—'

দরজা খুলে যায়। শীর্ণ বৃদ্ধা তখনও বকে চলেছেন, 'তিনদিন বাড়ি ফিরলি না, অন্ধ মানুষ আমি। পদ্ম ছুটি নেবে। একবার কি মনেও করতে নেই! কাল রেশন তোলার দিন চলে গেল—।' হঠাৎ থেমে যান। 'কে? তুমি পাখী না?'

রত্নেশ্বর নিজের পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেন। এতদিনে তাঁর সাবধানী বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করেন। খুব স্বাভাবিক ভাবে বলেন, 'মাসীমা, আমার এক বন্ধুর মেয়েকে পড়াতে হবে বলে পাখীর কাছে এসেছিলাম।

খ্কুকে যেভাবে পাখী তৈরী করে দিয়েছিল—'

'খ্কু অনেক বড় হয়ে গেছে, না ?'

'অনেক বড়, এবার তো ফাইনাল দেবে।'

বৃদ্ধা বলেন, 'খ্ব ভাল, কিন্তু পাখী কি আর ঐ চাকরি করবে ?'

ধীরে ধীরে জানতে পারলেন রত্নেশ্বর, তাঁদের বাড়ির টিউশনি ছাড়বার পর পাখীর স্কুলের চাকরিও যায়। ইংরেজী ভাল জানলে কি হবে, রং অত ময়লা বলে কোন রিসেপশনিস্ট-এর কাজ পাচ্ছিল না। শেষকালে তাও পেল। অনেক টাকা। পাখীর আনন্দ তখন দেখে কে ? মায়ের জন্য সারাদিনের একটা ঝি রেখে দিল। তারপর সে চাকরিও গেল একদিন। জিজ্ঞেস করলে ভাল করে জবাব দিত না। বলত, 'তুমি অন্ধ বুড়ো মানুষ, তোমার অত খবরে কাজ কি ? খেতে পরতে কোন অসুবিধে হচ্ছে তোমার ?' মা আঘাত পেতে না।—'তবে ওর মেজাজের কথা তুমি তো ভাল করেই জানো। একবার নাকি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ের কথাও হয়েছিল। কেন ভেঙে গেল জানেন না উনি। এই বছরখানেক হল কাদের যে ও নিয়ে আসত! বেশীর ভাগ ইংরেজিতেই কথা হত।' সংকোচ কাটিয়ে বললেন, 'মাঝে মাঝে মদের গন্ধও পেতাম।' তারপর কেঁদে উঠে বললেন, 'পাখী আর ভাল ছিল না বাবা!'

ইদানীং নাকি প্রায়ই রাতে ফিরত না। তবে দু'তিনদিনের ব্যাপার হলে বলে যেত। এবার বলেও যায়নি। আন্দাজে রত্নেশ্বরের হাত ধরতে চেষ্টা করেন মাসীমা। হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। মানুষের স্পর্শ পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বলেন তিনি, 'ও কিন্তু সত্যি বড় ভাল মেয়ে বাবা। এই তো সেদিন ঝি-এর মেয়ের বিয়েতে ধাঁ করে পাঁচশ টাকা দিয়ে দিল। আমার জন্য বিয়ে-থা করে সংসারী হতে পারল না। সেজন্য একদিনও আমাকে গঞ্জনা দেয়নি। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। ওর একটু খোঁজ করবে তুমি ? না বলে চার রাত্তির এল না—এমন ও কখনও করে না।' আবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কি করবেন রত্নেশ্বর এখন ?

—'ইয়ে, আপনার ঝি আসেনি ?'

—'আজ তো সে আসবে না, ঐ যে তার মেয়ের বিয়ে!'

শিউরে উঠলেন রত্নেশ্বর। একলা এই অন্ধ বৃদ্ধা এখন কি করবে ? আর তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ঐ খ্ন হওয়া মেয়ে পাখীই। এখন ? বৃদ্ধা কান্না সামলে বললেন, 'তোমাকে যে একটু চা করে খাওয়াব সে ক্ষমতাও

নেই।'

ত্রস্তে বলে ওঠেন রত্নেশ্বর, 'না না, সেকি! কিন্তু আপনি কি খাবেন?'

—'সে কৌটোতে মুড়ি আছে, গুড় আছে। আমার অভ্যেস আছে। কিন্তু পাখী এল না কেন, তুমি কিছু বুঝতে পারছ বাবা?'

অনেক কষ্টে একটা কান্নার দমক রোধ করে বলেন রত্নেশ্বর, 'হয়তো কোথাও আটকে গেছে। খবর দিতে পারেনি। দেখুন দুপুর নাগাদ হয়তো এসেও যেতে পারে। আমি যাই, বিকেলে এসে আবার খবর নিয়ে যাব।'

রাস্তায় একটু জল জমেছে। জনহীন রাস্তা। গাড়ি ছুটে চলল ভবানীপুরের দিকে। বিজিতেন্দ্রর বাড়িতে এসে কলিং বেল টিপলেন তিনি। স্বয়ং বিজিত দরজা খুলে রত্নকে দেখে প্রথমে অবাক হলেন। তারপর আনন্দে অধীর হয়ে জড়িয়ে ধরলেন।—'হোয়াট এ সারপ্রাইজ! এই বৃষ্টিতে এত বড় হিরো—দাঁড়া, মিনু মানে মীনাক্ষী—আমার বৌ—তাকে ডাকি। সে যা তোর ভক্ত না!'

রত্ন বিজিতের হাত ধরে প্রবল শক্তিতে টেনে রাখেন। মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। এইবার রত্নর মুখের দিকে তাকিয়ে বিজিত বলেন, 'কি হয়েছে রে? এনিথিং সিরিয়াস?' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে রত্ন। বিজিত দেখেন চাপা কান্নায় রত্নর দেহ ফুলে ফুলে উঠছে।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত করে বললেও চলে। বিজিত রত্নকে নিয়ে লালবাজারে যান। মর্গে সনাক্ত করা হয় পাখীকে। ওই লোকদুটোর একটা ধরা পড়েছে। আর একটা ফেরার, পুলিশের বিশ্বাস ওরাই খুন করেছে। রত্নেশ্বরের নাম, বিজিতেন্দ্রর প্রভাব সব মিলিয়ে রত্নর খুব বেশী ভোগান্তি হয়নি। পুলিশ কমিশনার রত্নর হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আপনার মত সেল্ফ্‌লেসলি সবাই যদি এগিয়ে আসত এরকম, অনেক খুন-ডাকাতির কিনারা করতে পারতাম আমরা!'—ইত্যাদি। পাখী শেষকালে তাহলে চোরাকারবারীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল!

পাখীর মাকে ছোট বোন টুকি হাজারিবাগে তার কাছে নিয়ে গেছে। রত্নেশ্বর কথা দিয়েছে, দুশো করে টাকা মাসীমার জন্য মাসে মাসে সে দেবে। টুকির বর নীরেন বার বার বলেছে, 'শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও যে রত্নেশ্বর কত বড়! পরের জন্য এরকম ঝুঁকি কে নেয়?' কেবল সোনালীর সঙ্গে এখনো মিটমাট হয়নি। সোনালীর দৃঢ় বিশ্বাস রত্নেশ্বরই সেদিন পাখীকে

পাঁচশ নাইটের উৎসব দেখতে নিমন্ত্রণ করেছিল। তবে বিজিতেন্দ্রবাবু আশা করেন, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। টাইম ইজ দা বেস্ট হিলার। আর একটা সামান্য গোলমাল হয়েছে—বিজিতেন্দ্রবাবু বলছেন, সেদিন উৎসবের আগে তিনি যে ত্যাগ স্বীকার নিয়ে রত্নকে লেকচার দিয়েছিলেন, তাতেই রত্নর এই পরিবর্তন হয়েছে। রত্নেশ্বর বলেছেন, পাখীকে দেখবার পর বিজিত কি বলেছে না বলেছে তা তাঁর মনেই ছিল না। এ সবই অবশ্য আমাদের বিজিতেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে শোনা। শীগগির এই ঘটনা নিয়ে তিনি একটা উপন্যাস লিখবেন। তবে কি-না 'ট্রেনের হুইসল'এ নায়িকা শম্পাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। এখানে পাখীকে উনি কিছুতেই মরতে দেবেন না। দারুণ একটা ফাইট দেবে নাকি পাখী! 'দেশের মাটিতে' কবে যে উপন্যাসটা বার হবে সেই অপেক্ষায় আছি। কারণ বিজিতেন্দ্রবাবুর উপন্যাস পড়তে আমাদের বাড়ির সকলেরই এত ভাল লাগে!!

অনসূয়াকে শকুন্তলা

অনসূয়াদি,

বেশ কয়েকদিন থেকে ভাবছি তোমাকে চিঠিটা লিখব। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। শেষকালে এখানে এসে লিখতে বসলাম। আজ সারারাত জেগে লিখতে হলেও চিঠি শেষ করব আর সামনাসামনি যে কথাগুলো কোনদিনই তোমাকে বলতে পারিনি আজ তা বলব।

কোন্ ছোটবেলায় তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম মনেও পড়ে না। জ্ঞান হয়ে থেকে দেখে আসছিলাম—সবাই খাটে শোয়, আমি মেঝেতে শুই। তোমার একটা আলাদা ঘর ছিল। তুমি শুতে খাটে, আমি আর বীণাদি শুতুম মেঝেতে। বীণাদি তোমাদের ঝি। আমি তোমার পিসতুতো বোন শকুন্তলা। যখন একদম ছোট, তারতম্যটা মাথায় ততটা ঢুকত না। কিন্তু একটু বড় হতেই বাড়ির ঝি-চাকর, আত্মীয়-স্বজন সবাই বুঝিয়ে দিল। বুঝলাম আমার অধিকার ঐ বীণাদির চাইতে একটুও বেশী নয়। বুঝলাম ঐ পর্যন্তই। ব্যথাটা একটু বাড়ল, আর কিছু নয়।

তোমার বাবা, অর্থাৎ আমার বড়মামা, যাঁর নামডাক ছিল প্রচণ্ড। একদিন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। আমাকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে—কেন, না হলে লোকে যা-তা বলবে। মামীও সায় দিলেন। তোমার ছোট পিসি অর্থাৎ আমার ছোট মাসী সেদিন এসে নাকি যা-তা বলে গেছেন। তখন আমার সাত বছর বয়স। সামান্য অক্ষর পরিচয় ছিল, ঐ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' অব্দি বিদ্যে। তাও ঐ বীণাদির জন্যেই। তা তার তো ঐটুকু বিদ্যে ছিল—আমারও

তাই ঐটুকু হয়েই থেমে ছিল সব। তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা পত্রিকা নিয়ে আসতে। পড়তে রাত জেগে। আমিও তুমি এদিক ওদিক গেলে লুকিয়ে ছবির তলার লেখাগুলো পড়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠতাম। পারতাম না। যুক্তাক্ষরের জ্ঞান তো একেবারেই ছিল না।

তুমি আমার বছর তিনেকের বড় ছিলে। তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় পাবার পর থেকেই দেখতাম তুমি স্কুলে যাচ্ছ বাসে করে—কিছুদিন পর থেকে অবশ্য বাড়ির গাড়ি করেই যেতে। তুমি সকাল আটটার মধ্যে বেরুবে, বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। কোন্ সকালে মামী উঠে তোমার বই গোছাতেন। বীণাদি একতলায় ঠাকুরকে তাড়া দিয়ে তোমার খাবার এবং টিফিন তৈরী করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। তারই ফাঁকে দৌড়ে এসে তোমার স্কার্ট ইস্ত্রি করতে বসত। তুমি কিছুতেই মোজা পরতে পারতে না। তাই আমাকে তোমায় মোজা পরিয়ে দিতে হোত। প্রথম দিন পারিনি বলে তুমি আমাকে 'উজবুক' বলে গালে একটা চড় মেরেছিলে। মামী তোমাকে মৃদু তিরস্কার করে আমার দিকে হাসি-হাসি মুখ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কেমন করে মোজা পরিয়ে দিতে হয়। তারপর আর আমার ভুল হয়নি কোনদিন। কয়েকদিন পরেই তুমি আমার গাল টিপে দিয়ে বলেছিলে, 'খুব কাজের মেয়ে তো তুই!' আমি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে তার পরদিন থেকে তোমাকে জুতোও পরিয়ে দিতে লাগলাম। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে তুমি আধখানা ক্যাড্‌বেরি চকোলেট দিয়েছিলে। তোমার খাবার সময় বীণাদি, মামী তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তুমি ভাল করে খাবে কিনা, বা হঠাৎ যদি তোমার কিছু দরকার পড়ে—আমাকেও কেন জানি না, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত। তারপর তুমি ঝড়ের মত বেরিয়ে যেতে। মামী বলতেন, 'যা শঙ্কু, ওর সঙ্গে গিয়ে ব্যাগটা ওর বাসে তুলে দিয়ে আয়।' ফিরে এলে মামী বলতেন, 'অনু তো অর্ধেক ভাত খায়ইনি, মাখন দেওয়া ভাত ডিম ফেলে দেব? যা শঙ্কু খেয়ে নে।' তুমি যখন খেতে তোমার খাওয়া দেখতে দেখতে আমার পেটে অসম্ভব মোচড় দিত। তাই আমি দৌড়ে গিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম। প্রথম দিন ভুল করে টেবিলে বসেই খেতে শুরু করে দিয়েছিলাম। মামী এসে যেন কেমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, 'শঙ্কু-মা, কাল থেকে থালাটা নামিয়ে মেঝেতে বসে ভাল করে খাস।' আর আমার ভুল হয়নি।

ভাল করে জ্ঞান হবার পর প্রথম পুজোটা মনে পড়ে। সব্বাইয়ের জামাকাপড় কেনা হচ্ছে। মামী দফায়-দফায় বাজারে যাচ্ছেন। আজ এর জিনিস, কাল ওর

জিনিস—ক্রমে ক্রমে মামীর মা, বাবা, বোন, বীণাদি, ঠাকুর, ড্রাইভার, তোমার তো বটেই, তোমার তিন জোড়া, সকলের জামাকাপড় কেনা হয়ে গেল। কেবল আমার আর মামীর বাকী। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে আছি, আমার জামাটা কেমন হবে! হ্যাঁ অনুদি, ধরেই নিয়েছিলাম আমার একটার বেশী জামা হবে না। সেটাও তোমার-গুলোর মত ভাল হবে না। মামা বাইরে কোথাও ট্যুরে গিয়েছিলেন। ফিরে এলে সেই সন্ধ্যায় মামী আলমারী খুলে থরে থরে সব নামিয়ে মামাকে দেখাতে লাগলেন। সব দেখে মামা বললেন, 'শঙ্কুরটা কোথায়?' মামী বললেন, 'ওর জন্য কিনে কি হবে! অনুর কত সুন্দর সুন্দর পোশাক ছোট হয়ে গেছে। এক-একটা তো দু এক বারের বেশী পরেইনি। ওই ধুয়ে ইস্ত্রি করে দিলে সবাই নতুনই ভাববে!' আমার হৃৎপিণ্ড তখন একটুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল। ছুটে একতলায় চলে গিয়েছিলাম। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলাম। বীণাদি খাবার নিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি হয়েছে শঙ্কু?' উত্তর দিইনি। বীণাদির তো দাঁড়াবার সময় ছিল না। রাতে বীণাদি আবার চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিল, বলেছিলাম, সিঁড়ির নীচটা খুব অন্ধকার তো, হঠাৎ ভূতের ভয় করে উঠেছিল।

সেই থেকে শুরু হয়ে গেল—তোমার পাতের এঁটো খেয়ে আর তোমার ছোট হয়ে যাওয়া জামা-কাপড় পরে আমার বড় হওয়া।

হ্যাঁ, স্কুলে ভর্তি হবার কথাটায় আবার ফিরে যাই। বড় দরকারী কথা। স্কুলের কথা শুনে মনটা আরেকবার আনন্দে নেচে উঠল। তবে ততদিনে নিজের আবেগগুলো প্রকাশ না করাই যে বুদ্ধিমানের কাজ তা শিখে গেছি। তাই এমন একটা মুখের ভাব করে রইলাম, যেন স্কুলে ভর্তি হওয়া বা না হওয়ায় আমার কিছু যায় আসে না। মনে মনে ভেবেছিলাম, তোমার স্কুলেরই বোধহয় নীচের ক্লাসে ভর্তি হব। যদিও জানতাম তা হবে না, তবু ভেবেছিলাম। তোমার মত ঐরকম নীল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরব। ঐরকম মোজা জুতো। চুলে বাঁধব সাদা ফিতে। আর তুমি যেমন করে ইংরেজি বল তেমনি করে আমিও বলব। কিন্তু দুদিন পরেই জানতে পারলাম, আমি বাড়ির কাছেই চাঁদু বাবু লেনের নীরজামোহিনী স্কুলে ভর্তি হব। মামী বললেন, 'ভালই হল, ইউনিফরম-টরমের হাঙ্গামা নেই। ছুটি হলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতে

পারবি। বীণারও অসুবিধে হবে না। ওর হাতে হাতে আগের মত কাজগুলো করে দিতে পারবি।' আমি খুব খুশী-খুশী ভাবে হাসলাম। তুমি স্কুলে চলে গেলে অনেকদিন পর মায়ের তোরঙ্গটা খুললাম। আমার বাবার এবং মায়ের কোন ছবি ছিল না। বাবা তো আমার এক বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। মা মারা যান তোমাদের বাড়িতে এসে। তোরঙ্গের মধ্যে ছিল বাবার দু'একটা চিঠি, ডায়রি মত একটা খাতা, মায়ের লক্ষ্মীর পাঁচালী, হিসেবের খাতা, সধবা সময়ের দুটো শাড়ী—লাল আর সবুজ পাড়ের। বাবার একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি—মা খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন—বিধবার খান-দুই থান—সাবানের বাক্স, একটা গীতা ইত্যাদি। কেমন একটা পুরনো গন্ধ নাকে আসতে লাগল। মা'কে মনে করতে চেষ্টা করলাম। মুখটা অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল। কেবল দেখতে পেলাম মায়ের অলংকারহীন দুটো হাত, ফাটা নখ,—সেই হাত দুটো কেবল কাজ করে চলেছে। কখনো বাসন মাজছে, খুন্তি নাড়ছে, সেলাই করছে,—'মা' বলে চাপা চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। অমনি মায়ের মুখটা দেখতে পেলাম। মায়ের মরা মুখ। কি অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে মা খাটটায় শুয়েছিলেন!

পরদিন আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে তোমাদের ড্রাইভার। ফরম আগেই আনা হয়েছিল। তুমি স্কুলে যাওনি। মামা বললেন, 'অনু, ফরমটা ফিল-আপ করে দে, আমি সই করে দিচ্ছি।' তুমি ফরমটা নিয়ে একটুক্ষণ কি ভাবলে, তারপর কলমটা রেখে চেয়ারের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বললে, 'কি নাম দেব?' মামী মামার জামার বোতাম লাগাচ্ছিলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'ওমা, সে কি! তুই কি ওর নামটাও ভুলে গেলি? শকুন্তলা পণ্ডিত।' তুমি বললে, 'না, ও নাম তো দেওয়া যাবে না।' মামী বললেন, 'কেন?' মামাও অবাক হয়ে তাকালেন। তুমি বললে, 'ও নামটা ভাল শোনায় না, কেমন কেমন লাগে যেন। এত্তো বড় নাম! বাব্বাঃ, বড়পিসি আর নাম খুঁজে পায়নি!' মামী বললেন, 'তোর নামটাই বা কম কি? অনসূয়া!—তোর বাবার দেওয়া নাম।' তুমি গলা চড়িয়ে বললে, 'আমার নাম অনসূয়া দেওয়া হয়েছে বলেই বুঝি বড়পিসি নিজের মেয়ের নাম দিল শকুন্তলা?' মামা বললেন, 'সে আবার কি কথা!' মামা-মামীতে চোখাচোখি হোল। দুজনেই যেন আতঙ্কিত।—'কি কথা আবার! সেদিন শকু বললে, অনসূয়া তো শকুন্তলার দাসী ছিল—আর বলার কি ভঙ্গী!' মামী—'সে কি! কখন?' তুমি—'ঐ তো, যেদিন

হৈমন্তী এসেছিল।' মামী—'ছিঃ ছিঃ, সে কি শুকু, তোমাকে তো আমি অন্য-রকম জানতাম!' মামা বললেন, 'থাক্ থাক্, ওসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি? নামটা বদলে দে।' মামা যেন বুঝতেই পারছিলেন, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। মামীও কি ভেবে বললেন, 'সেই ভাল। ওর আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তুমি খুশী হয়ে বললে, 'তাহলে লিখে দিই বিমলা—' মামা বললেন, 'অত দূরে যাবার দরকার কি? শুকুর সঙ্গে মিল রেখেই নামটা রাখ না। ধর—শুকতারা।' মামার বলার মধ্যে কি যেন একটা ছিল, তুমি আর কিছু বললে না। ব্যস, আমার বাপ-মার দেওয়া নামটা বাতিল হয়ে গেল। আমি হয়ে গেলাম শুকতারা পণ্ডিত। সেদিনও আমার খুব কান্না পেয়েছিল। কিন্তু তখন কান্না চাপতে শিখেছি। বাবা-মা নেই, কোথাও কেউ নেই, তা তো জানি। কিন্তু তবু মনে হোল, তাঁদের দেওয়া নামটা খারিজ করে দিয়ে তোমরা যেন তাঁদের আরও দূরে সরিয়ে দিলে। অথচ যেদিন হৈমন্তীদি এসেছিল, তুমি আমার ট্যারা চোখ নিয়ে আমাকে প্রচণ্ডবেগে ঠাট্টা করে চলেছিলে। যদিও সবাই বলে, আমার চোখ দুটি সুন্দর। যেটুকু ট্যারা তা নাকি লক্ষ্মী-ট্যারা। কিন্তু তুমি তা মানতে না। তোমার ঠাট্টাটা যখন চরমে উঠেছিল, তখন হৈমন্তীদি বলে উঠল, 'অনসুয়া অত অহংকার করিস না, হাজার হলেও মহাভারতে লেখে অনসুয়া শকুন্তলার দাসী ছিল। আর শকুন্তলা হল ভারতস্রষ্টা ভরতের মা।' তুমি বললে, 'তার মানে?' বীণাদি বললে, 'ঠিক ঠিক।' আর আমার সাহস হল না সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার।

তখনই আমার মনে হয়েছিল, এর একটা বিহিত তুমি করবেই। সেই রাতে, ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসছিল, তখন তুমি আমাকে ডেকে বলেছিলে, 'ও ভরতের মা, দয়া করে উঠে টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা দেবে আমাকে?' আর তার দুদিন বাদেই 'শকুন্তলা বিসর্জন নাটক' হয়ে গেল, মনে পড়ে? অনেক বছর পরে, জ্ঞান আরও বাড়লে বুঝেছিলাম, হৈমন্তীদি খুব ভুল বলেছিল। অনসুয়া শকুন্তলার দাসী ছিল না তো, ছিল সখী—বন্ধু! ওঃ অনসুয়াদি, তুমি যদি আমার বন্ধু হতে! তবে আজ সমস্ত ব্যাপারটা অন্য রকম হোত।

যাই হোক স্কুলে ভর্তি হলাম। তোমার পুরোনো ব্যাগে বই ভরে নিয়ে স্কুলে গেলাম। আমার চাইতে অনেক ছোট বয়সের মেয়েদের সঙ্গে প্রথমদিন ক্লাসে বসতে বেশ লজ্জা করেছিল। ডলিদি, আমাদের ক্লাসটিচার—প্রথমদিন

আমায় দেখে বললেন, 'তোমার নাম শুকতারা ?' উত্তর দিতে এক লহমা দেরি হয়েছিল—ওঃ, আমি তো এখন শুকতারা! দাঁড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।' 'এই বয়সে ক্লাস ওয়ানে কেন ?' ডলিদির তীক্ষ্ন জিজ্ঞাসা, 'এতদিন কি করছিলে ? ঘোড়ার ঘাস কাটছিলে ? বাবা-মা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন ?' ক্লাসের যে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, সেই রাণু তাড়াতাড়ি উঠে বলল, 'ওর বাবা-মা কেউ নেই দিদিমণি!' 'মানে ?' রাণু বললে, 'মানে তাঁরা মরে গেছেন।' ডলিদি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওঃ, তাঁদের আগেই খেয়ে বসে আছ!' ওঁর কথা বলার ধরণই ওরকম ছিল। 'তা তোমার গার্জেন কে ?' বললাম, 'মামা।' 'নাম কি ?' আমি মামার নাম বললাম। ডলিদি কিরকম করে তাকিয়ে বললেন, 'তা তুমি এ স্কুলে মরতে এলে কেন ? যাকগে ওসবে আমারই বা দরকার কী!'

স্কুলে আমার পাঠ শুরু হোল। তোমার ফেলে দেওয়া সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফ্রকগুলো আমার গায়ে আশ্চর্যরকম ফিট করে গিয়ে অন্য মেয়েদের ঈর্ষার উদ্রেক করত। আমারও কেমন গর্ববোধ হোত। মানুষের মন বড় আশ্চর্য। ওরা তো আর বুঝতে পারত না যে, এগুলো আমার জন্যে তৈরী হয়নি। তাই আমার কোন কুণ্ঠা থাকত না। ওদের সপ্রশংস দৃষ্টি আমার বেশ ভাল লাগত। তোমার সেই গাঢ় সবুজ আর ফিকে সবুজের কম্বিনেশন করা ফ্রকটা! তোমার বোধহয় মনেই নেই। সেটা পরে একদিন স্কুলে গেছি। ওটা তো তুমি দুবার-এর বেশী পরইনি! রাণু জিজ্ঞাসা করল, 'তোর মামীমা এটা বুঝি তোকে নতুন করিয়ে দিলে ?' বললাম, 'হ্যাঁ।' 'অনেক টাকা লেগেছে ?' বললাম, 'একশো টাকা।' আমার জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে আমি একেবারেই মিথ্যা বলিনি। মামী ফ্রকটা আমায় দিয়ে বলেছিলেন, 'দ্যাখ না, এই তো মাত্র সেদিন একশো টাকা খরচা করে করালাম, তা মেয়ের এ রং পছন্দই হল না! ঝুলে কেবল একটু বড় হচ্ছে। নে তো শুকু, একটু মুড়ে নে তো!' রাণু বললে, 'একশো!' পাশ দিয়ে যাচ্ছিল পূর্বাশা। বললে, 'যাঃ! শুকতারাটা বড্ড চাল মারে। এ জামার দাম ষাট টাকার বেশী হতেই পাবে না। এই শুকতারা, বড়লোক আছিস বাড়িতে আছিস, স্কুলে এসে চাল মারিস না তো!' বললাম, 'আমি চাল মারিনি।' পূর্বাশা বললে, 'যাঃ যাঃ, বেশী কথা বলিস না। পড়াশোনায় লবডংকা। এই বয়সে রাণুদের সঙ্গে পড়ে, তাই ফ্যাশন করে মূর্খামিটা ঢাকতে চায়!' কি লজ্জা যে সেদিন করেছিল! বাড়িতে আসতে বীণাদি জিজ্ঞাসা করল, 'ইস্কুলে কিছু

হয়েছে শকু ?' বললাম সব কথা। জানতে পারলাম, সত্যি ফ্রকটার সর্বসাকুল্যে দাম পড়েছিল পঁয়ষট্টি টাকা। মামী ওটা বাড়িয়ে বলেছিল। আর এক দফা লজ্জায় আমার গায়ের মধ্যেটা কেমন করে উঠল।

পরদিন ছুটির পর দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ পূর্বাশাদের ছুটি হবে আরও পরে। গেট দিয়ে বড় ক্লাসের মেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার বুকের ভিতরটা ধক্‌ধক্‌ করতে লাগল। পারব তো? পূর্বাশা বুকে বই জড়িয়ে ধরে আর একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। ডাকলাম, 'শোন।' এইটুকু বলতে আমার শক্তি যেন ফুরিয়ে গেল। ও বলল, 'আমাকে ডাকছ ?' মাথা নাড়লাম। ও এগিয়ে এল। আমি চুপ। বন্ধুদের পূর্বাশা বললে, 'তোরা যা, আমি আসছি।' আমাকে বললে, 'বল !' প্রাণপণ শক্তিতে গলার শব্দযন্ত্রটাকে চালু করে বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, ঐ ফ্রকটার দাম একশ টাকা নয়।' বুঝতে পারছিলাম আমার গলা কেঁপে যাচ্ছে। চোখে জল আসছে।

ও বললে, 'আরে ! এই তুমি কেঁদো না। আমি তোমাকে—।'

আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তারপর একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরেছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত বেশী বয়সে আমি পড়া শুরু করলাম কেন ?'

না, তোমাদের কোন দোষ আমি দিইনি অনুদি। বললাম, 'খুব রোগে ভুগতাম তো, তাই।'

বাড়িতে আসতেই মামী রাগে যেন ফেটে পড়ল, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? ইস্কুলে গিয়েই খুব পা বেড়ে গেছে, না ? আজ ছোটকু আসবে, বীণা একা একা সব পারে ? বলিনি আজ তাড়াতাড়ি চলে আসবি !'

মনে পড়ছে, তুমি এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখটা সরু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে। ভুলেই গিয়েছিলাম, মামীর ছোট ভাই তোমার বিলেতফেরত ছোট মামা আসবেন। তাই দুপুরের পর থেকেই ডিনারের নানা আয়োজন করবার কথাই তো। মামীর মেজাজ আর তোমার চোখ দেখে আমার গলা শুকিয়ে উঠল। মামী বললে, 'সত্যি কথা বল শকু, কোথায় গিয়েছিলি ?'

হঠাৎ দেখি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'পড়া পারিনি তাই দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, বড় ক্লাসের সঙ্গে ছুটি দিল।' তোমাদের চোখাচোখি হোল। অর্থাৎ হ্যাঁ, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য।

মামী বললে, 'তা পড়া করইনি বা কেন ?' গলাটা এবার যথেষ্ট দুর্বল,

'অনুর কাছে একটু-আধটু দেখিয়ে নিলেও তো পার।'

তুমি বললে, 'রক্ষে কর বাবা! ঐ গবেটকে আমার ঘাড়ে চাপিও না। আমার নিজের যথেষ্ট পড়াশোনা আছে।'

মামী বললে, 'তা একটু দেখিয়ে না দিলে আমাদেরই তো বদনাম হবে।'

তোমার গলা চড়ে গেল। বললে, 'তুমি পার না? শুনেছি তো বি. এ. পাশ। বাবা-মা কি ধানচাল দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল? খালি রেডিও শুনবে! সিনেমার বই পড়বে!'

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে গেলে তুমি। মামী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তুমি অস্বাভাবিক জোরে তোমার রেকর্ডপ্লেয়ারটা চালিয়ে দিলে।

মামী নির্জীবের মত বললেন, 'যা তাড়াতাড়ি, খেয়ে নিয়ে ঘরগুলো ঝেড়ে-পুঁছে রান্নাঘরে চলে যা।'

এই ঘটনার ফলে আমার কিন্তু বেশ একটা লাভ হল। মামী সত্যিসত্যি আমায় পড়া দেখিয়ে দিতে লাগলেন। ওদিকে টিফিনের সময় পূর্বাদিও—ততদিনে ভাববাচ্য ছেড়ে আমি ওকে পূর্বাদি বলতাম, আমার এক বছরের বড়—আমার তিনক্লাস ওপরের পড়ুয়া সেদিন আমার জন্যে করুণা অনুভব করেছিল।

একদিন ক্লাসে সবকটা প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে দিলাম। ডলিদি বললেন, 'ভেরী গুড। প্রথম দিন দেখে মনে হয়েছিল একটা বাণ্ডিল। নাঃ, বুদ্ধি আছে দেখছি। এই তো চাই।' সত্যি খুশী হয়েছিলেন ডলিদি।

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। যথারীতি পুজো কাটল তোমার অতীব সুন্দর কর্ডের জামা আর বেলবটস্ পরে। যথারীতি কালীপুজোর দিন ছাতে গিয়ে বাজী পোড়ালাম আমরা। বাজী পোড়াবার সময় মামা থাকতেন আমাদের সঙ্গে, কি ছেলেমানুষিই না করতেন। ছেলেমানুষের মত হাসতেন। আর সেই হাসি দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যেত। কিন্তু পরদিনই আবার যে-কে সেই—কি গম্ভীর! কি খারাপ লাগত। একটা কাছের লোক যেন দূরে চলে গেল। দেখতে দেখতে এ্যানুয়েল পরীক্ষা এসে গেল। আমরা দুজনেই রাত জেগে পড়তে লাগলাম। তবে আমার দৈনন্দিন কাজ থেকে আমার রেহাই ছিল না। ভোর চারটেয় তুমি পড়তে বসতে। তোমাকে ওভালটিন করে দিয়ে আমি পড়তে বসতাম। অবশ্য তুমি কতগুলো বই পড়তে, আর আমি মোটে ক'টা বই। পরীক্ষা এগিয়ে আসে। পূর্বাদির জেদ বেড়ে যায়, টিফিনের পুরো সময়টা কেবল আমাকে অঙ্কই করাতে লাগল। বলত, 'ফার্স্ট' তোকে

হতেই হবে।' মামীও একটু বেশী সময় দিতেন। পরীক্ষার রেজাল্ট যেদিন বের হবে, দুরুদুরু বুকে ক্লাসে গেলাম। ক্লাস নাইন থেকে প্রমোশন হতে হতে আসছে। নাইনের মেয়েরা টেনের ঘরে যাচ্ছে—এইটের মেয়েবা নাইনে—আমাদের ক্লাসেব ডলিদি বললেন, 'শুকতারা, তুমি এদিকে এস। সত্যি তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। কোন বিষয়েই তুমি আশির নীচে পাওনি। এবং অঙ্কে একশ'র মধ্যে এক'শ পেয়েছ। তাই বড়দি আমাদের হেড্‌মিস্ট্রেস রেবা চৌধুরী তোমাকে ডবল প্রমোশন দিয়েছেন। তুমি ক্লাস থ্রি'র রুমে চলে যাও।' আমি ডলিদির মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। 'কি হল? চেনো না ক্লাস থ্রি? শোভনা, তুমি ওকে ক্লাস থ্রিতে পেঁছে দিয়ে এস বরং।' শোভনাদি আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, 'ডলিদিকে প্রণাম কর।' ক্লাস থ্রি-তে যেতেই মেয়েরা আমাকে অভ্যর্থনা করল। ডবল প্রমোশন সোজা কথা! জীবনে এরকম একটা থ্রিলিং ব্যাপার ঘটতে পারে এ ধারণাই ছিল না।

সেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়েছিল। এক কোণে পূর্বাদির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ও আসতেই ঝুপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিলাম।

ও পিছিয়ে গিয়ে হেসে উঠল, তারপর বলল, 'কেমন বলেছিলাম কিনা, কষ্ট করলে, মানে মন দিয়ে কষ্ট করলে তার কোন একটা ফল কোথাও হবেই। বাবা আমাদের এই কথাটা প্রায়ই বলেন,—চ আমাদের বাড়ি চ, বাবাকে দেখবি।'

আমি ত্রস্তে বলে উঠলাম, 'দেরি হলে মামী বকবে।'

—'দূর, জানবে কি করে! এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়েছে—তাছাড়া আমাদের বাড়ি তো বেশী দূরে নয়, বেশীক্ষণ তোকে আটকে রাখব না।'

গেলাম। ওরা তোমাদের মত অত বড়লোক নয়। তবে গরীবও নয়। কি পরিষ্কার করে বাড়িটা সাজানো। পূর্বাদির বাবা কলকাতা ইউনিভার্সিটির দর্শনের প্রফেসর ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। চুলগুলোতে পাকার ভাগই বেশী। গেরুয়া লুঙির ওপর গেরুয়া পাঞ্জাবি। এমন একটি সৌম্যদর্শন লোক আগে আমি দেখিনি। বাবা বলতে যে কল্পনা হয় একেবারে যেন তাই। শুনেছিলাম আমার বাবাও খুব পণ্ডিত আর ভাল লোক ছিলেন। পূর্বাদির বাবা আর আমার বাবা যেন এক হয়ে গেলেন। আমি আর পূর্বাদি প্রণাম করলাম। পূর্বাদি বলল, 'বাবা এর কথা তোমাকে বলেছিলাম, শুকতারা, এবারে ডবল প্রমোশন পেয়েছে।' বাবা বললেন, 'বাঃ, বেশ ভাল। এ বছরটা আরো ভাল করে পড়—সামনের বার আবার ডবল পাওয়া চাই।' এমনভাবে

কথা বলছিলেন যেন কতদিনের চেনা।—'কিন্তু তোর কথা বললি না? দেখি রিপোর্ট?' পূর্বাদি রিপোর্ট দিতে দিতে বলল, 'আমার ফী-বার যেমন হয় তেমনই হয়েছে।' 'ফার্স্ট? তোর বৌদিকে বল তোদের মিষ্টিটিষ্টি দিক।' রিপোর্ট দেখতে লাগলেন। 'বৌদি বোধহয় পড়ছে। দেখি গিরিবালা জেগে আছে নাকি!' অবাক হয়ে ভাবলাম, এ বাড়িতে সবাই পড়ে নাকি? পূর্বাদির বৌদি এম. এ. দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। ওদের চারটে ঘরের চারদিকে কেবল বই আর বই। আর কত রকমের। কেমন অবাক লাগছিল। বললাম, 'তোমার মা কোথায়?' ও বললে, 'আমারও মা নেই রে। আমার দু'বছর বয়সে মা মারা গেছেন।' তারপর ওর বাবার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর মায়ের লাইফ-সাইজ অয়েল-পেইন্টিংটা দেখাল। কত যত্ন করে রাখা। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

বাড়িতে এসে দেখি সকলে হৈ-হৈ করছে। তুমি রেজাল্ট নিয়ে ফিরেছ। এতগুলো মেয়ের মধ্যে তুমি ফিফ্থ হয়েছ। ঐরকম একটা জাঁদরেল স্কুলে ফিফ্থ হওয়া কম কথা নয়!. মামী বললে, 'শুনেছিস শঙ্কু, তোর অনুদি কত ভাল রেজাল্ট করেছে! যা রান্নাঘরে বীণাদির সঙ্গে তাড়াতাড়ি হাত লাগাগে। ঠাকুরটার আবার জ্বর হয়েছে। এখুনি তোর মামা ছোটকু সবাই এসে পড়বে।' রান্নাঘরে বীণাদি বললে, 'কি শঙ্কু, তোমার না আজ ফল বেরুবার কথা? কি হল?' বললাম. 'বীণাদি, আমি ফার্স্ট হয়েছি।' 'মানে?' 'মানে আমাকে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস থিতে তুলে দিয়েছে।' বলেই বীণাদিকে এক প্রণাম ঠুকে দিলাম। বীণাদি এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, কি করলে, তোমরা না ব্রাহ্মণ!'

অনেক পরে চায়ের টেবিলে যখন তোমরা ডিমের চপ, চিংড়ি-ফ্রাইট্রাই দিয়ে চা খাচ্ছিলে, ছোটকুমামাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'শঙ্কুর রেজাল্ট কবে বের হবে?' মামা মামী দুজনেই বলে উঠলেন, 'তাই তো! তোরটা কবে?'

—'আজ হয়ে গেছে।' বললাম।

—'তাই নাকি? তা পাসটাস করতে পেরেছিস তো? কি রে, হাঁ করে রইলি কেন?'

—'আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়েছে।' সবাই কেমন চুপ করে গেল। প্রথমে ছোটকুমামাই হৈ-হৈ করে উঠে বললেন, 'আরে তাই নাকি, মিস্ পণ্ডিত কামাল কর দিয়া। এস এস এদিকে, দুটো চিংড়িফ্রাই হয়ে যাক্'—আমাকে টেনে

নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তোমরা কেউ কিছু বলতে পারলে না। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে তাকিয়ে ছিলাম তোমার দিকে। তুমি সরু চোখে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। মামী অবস্থাটা ম্যানেজ করার জন্য বললেন, 'বল অনু, আমি কেমন মাস্টার? এখনও কি বলবি, আমি ধানচাল দিয়ে পাশ করেছি?' মামা বললেন, 'যাক, শঙ্কু আমার মুখ রেখেছে।' সেই থেকে আমার খাবার টেবিলেও প্রমোশন হল।

রাত্রে তোমার খুব জ্বর এল। তোমার মুখটা খুব করুণ দেখাচ্ছিল। আমি পাখা দিয়ে তোমার মাথায় আস্তে আস্তে হাওয়া করছিলাম। আমার কেবলি নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল কেন জানি না।

সূর্য ডোবে সূর্য ওঠে। দিন গড়িয়ে যায়। আমরা বড় হই। তুমি মাঝে মাঝে শাড়ী পর। মামী বলে, 'শাড়ী পরলে অনুটাকে কি সুন্দর লাগে দেখতে, তাই না রে শঙ্কু!' সত্যি, তোমাকে হঠাৎ যেন খুবই সুন্দর দেখতে লাগল। সুন্দর অবশ্য তুমি বরাবরই। মামীর মতই তোমার ফর্সা রঙ। ঐ রকম ঢেউ খেলানো চুল, পাছা ছাড়িয়ে পড়েছে। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম তোমার প্রতি। তোমার ঘরে বড় ড্রেসিং টেবিল এল। এল নানারকম প্রসাধন দ্রব্য। রাতে পরে শোবার জন্য নাইটি। ফিকে নীল, হাল্কা গোলাপী, আরও কত রং-এর। মামী তোমাকে সবসময় সাজিয়ে রাখবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। তুমি যখন সারা গায়ে পাউডার মেখে দুপাশে দুই বিনুনি ঝুলিয়ে শুতে যেতে—সেই আঘ্রাণ নাকে নিয়ে ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসত। একদিন স্বপ্ন দেখলাম, এক পরী আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে—আমিও যাচ্ছি তার পেছন পেছন, এক মস্ত ফুলের বাগান পেরিয়ে চললাম। ফুলের গন্ধে আমার শরীর কেমন হাল্কা হয়ে গেল। তারপর সে একটা মস্ত ঘরে ঢুকল। তার চারপাশে থরে থরে কত পোশাক সাজানো। পরী বললে, 'শঙ্কু, তোমার নতুন পোশাক পরতে ইচ্ছে করে? তাহলে এর থেকে যেটা খুশী তুলে পরে নাও।' কত যে সুন্দর ফ্রক, বেলবটস্, শার্ট, নাইটি—যেন শেষ নেই। আমি কোনটা যে নেবো বুঝতেই পারছি না। 'কি হল, নাও!' পরী বললে। আমার সব গুলিয়ে যেতে লাগল। কোনটা—কোনটা নেব? 'এত দেরি করলে চলবে কেন?' হঠাৎ যেন পোশাকগুলো নাচতে নাচতে দূরে চলে যেতে লাগল। বললাম, 'একটু দাঁড়াও।' কিন্তু ওরা মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। বীণাদি গায়ে ঠেলা দিয়ে

জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হয়েছে শুকু, কাঁদছ কেন?' তুমিও উঠে পড়লে।—'কি হল, কান্না কেন?' আমি হাঁ করে তোমার দিকে চেয়ে রইলাম। সেই পরীর সঙ্গে তোমার আশ্চর্য মিল। পরীরও তো এইরকম লম্বা দুটো বিনুনি করা ছিল। তুমি রেগে বললে, 'নাও দিস ইজ টু মাচ। শুকু, রাত্তিরটা ঘুমোবার জন্য, কাঁদবার জন্যে নয়—নেক্সট টাইম এরকম হলে বার করে দেব।' রাত্তিরটা কাঁদবার জন্য নয়, কিন্তু আমি যে ঐ বয়সেই জেনে গেছি. রাত্তিরের অনেকগুলো মুহূর্ত কেবল কাঁদবার জন্যেই। পরে তো তুমিও জেনেছিলে অনুদি, তাই নয়?

তার পরদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে জানলাম. আমার আর বীণাদির শোবার ব্যবস্থা হয়েছে খাবার ঘরে। এই ঘটনার আগে কিংবা পরে মনে নেই, একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা পুজোর সময় আর কি। মারকেটিং-এ বেরিয়েছি আমরা। তোমার হঠাৎ মনে হল, তোমার আর এক জোড়া স্কার্ট ব্লাউজ কিনতে হবে। মনে পড়ছে, নিউ মার্কেটের সেই দোকানটায় গেলাম? তুমি যেটা পছন্দ করেছিলে আমার সেটা মোটেই ভাল লাগছিল না। আমার পছন্দ হচ্ছিল নীল, খয়েরি আর ফিকে হলদে দেওয়া চেকের একটা স্কার্ট, আর ঐরকম বর্ডার দেওয়া একটা সাদা ব্লাউজ। আমি তোমাকে কেবল বলতে লাগলাম, 'অনুদি, ঐইটে তোমাকে খুব মানাবে।' কারণ তোমার পুরনো হলে আমাকেই তো পরতে হবে ওটা। ঐ রং-এর স্কার্টটা আমাকে টানছিল। বার বার আমার মুখে কথাটা শুনতে শুনতে—তোমাদের কেমন বিশ্বাস হল কথাটা, ওটাই কিনলে। আমাকে অবশ্য এক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যাই হোক খাবার ঘরে শুতে আমাদের খুব একটা অসুবিধে হয়নি। খুব যখন গরম পড়ত তখন পাখার অভাবটা অনুভব করতাম। কারণ মামী বলে দিয়েছিলেন, 'দেখিস শুকু, যখন-তখন আবার পাখা খুলে বসিস না। যা ইলেকট্রিকের বিল ওঠে। পারা যায় না। তাছাড় এটা তো দক্ষিণের ঘর।'

সেই সময় তোমার স্কুল থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরি হতে লাগল। কখনও কোচিং, কখনো টেবিল টেনিস, কখনও বা অন্য কোন কারণে। তোমার ঘর গোছাতে গিয়ে আমি কিন্তু তোমার একটা চিঠি দেখে ফেলেছিলাম। তার আদিতে ছিল না কোন সম্বোধন। অন্তে ছিল না কোন স্বাক্ষর। তবে তোমার দেহের বর্ণনা এমন সুন্দর করে দেওয়া ছিল. যে পড়ে আমার সারা গা ঘিন ঘিন করে উঠেছিল। ইতিমধ্যে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। বীণাদিও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, ঘুমের মধ্যে একদিন আমাকে এমনভাবে

জড়িয়ে ধরল, আমার সমস্ত ব্যাপারটা অশুভ মনে হতে লাগল। যেন কারো পরামর্শ দরকার, যেন কিছু আমার জেনে নেওয়া দরকাব। আমিও তো তখন বড় হবার পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করব? পূর্বাদি? কিন্তু না, ওকে—ওদের বাড়ির সবাইকে এমন পবিত্র-পবিত্র মনে হয়, ওর সামনে উচ্চারণ করাই যাবে না। ছোটকুমামা দুর্গাপুরে ইঞ্জিনীয়ার। শনি-রবিবার কলকাতা চলে আসেন। নীচের ড্রইংরুমে থাকেন। আগে আসতেন না। এলেও থাকতেন না। সেই সময়ের পরেও আসেননি। কিন্তু সেই চার মাস—সেই নিদারুণ চার মাস! একদিন মামা-মামী কি একটা পার্টিতে গেছেন। তুমি হৈমন্তীদিদের সঙ্গে গেছ সিনেমায়। ওদের ওখানেই খেয়ে আসবে বলেছ। সেই সুযোগে ঠাকুর নিয়েছে ছুটি। ছোটকুমামা এলেন। বীণাদি কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। দুজনেরই ব্যবহার আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছিল। আমি না থাকলেই যেন ওরা খুশী হয়। বীণাদিকে বললাম, 'পূর্বাদির বাড়ি যেতে হবে, খুব দরকার আছে।' বীণাদি আপত্তি করেনি। তার পরের শনিবার রাতে বীণাদিকে অনেকক্ষণ আমার পাশে দেখিনি। আর তার মাস-খানেক পর থেকে ছোটকুমামা আর আসেননি।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি, বীণাদি মামীর ঘরের মেঝেতে ঘাড় হেঁট করে বসে আছে আর মামী জেরা করে চলেছেন।—'কে? কে? বল! ছিঃ ছিঃ, তোমাকে তো অন্যরকম জানতাম। ভদ্রঘরের বিধবা, শেষকালে ঠাকুরটার সঙ্গে—' বীণাদি ডুকরে উঠে বলল, 'নাঃ নাঃ, ওকে মিথ্যে দোষ দেবেন না।' মামীর এরকম চেহারা আমি আগে দেখিনি। সেদিন মনে হয়েছিল, বীণাদি বলির পাঁঠা আর মামী যেন জহ্লাদ। শেষ পর্যন্ত বীণাদিকে নাম বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে মামীর মুখ দিয়ে যে ভাষা বের হতে লাগল, সেটা ঐ সাজানো ঘরে মানাচ্ছিল না। স্কুলে যেতে আসতে বস্তির কলটার ধারে মাঝে মাঝে ঐসব কথা শুনে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠত অবশ্য। পরদিন বীণাদিকে চলে যেতে হবে। রাতে বীণাদি হাউহাউ করে কাঁদছিল, বললে, 'শুকু, আমাকে তোমার ছোটকুমামার ঠিকানাটা দিতে পার?' আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু বোধহয় তার দিনসাতেক আগেই ছোটকুমামা বিলেত চলে গিয়েছিলেন। শেষ অব্দি বীণাদিকে আর দুই দিন থাকবার অনুমতি আর একশটা টাকা দেওয়া হয়েছিল। মামা-মামীও একটু ভয় পেয়েছিল।—'বীণা আবার ছোটকুমামার নামে কোথায় কি বলে বসে!' পরদিন বীণাদি সকালে বেরিয়ে গেল ঘণ্টা দুই-এর জন্য। মামী কড়া করে জিজ্ঞাসা

করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ ?' বীণাদি শক্ত হয়ে বলল, 'একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।' ফিরে এসে বীণাদি স্বাভাবিক ভাবেই কাজকর্ম করল। খেলো। দুপুরে একটা ময়লা চিরকুট ঠিকানা লেখা একটা কাগজ আর পঁচাত্তরটা টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আমি চলে গেলে যেমন করে পার এই ঠিকানায় আমার শাশুড়ীকে টাকা ক'টা পাঠিয়ে দিও, লক্ষ্মী বোনটি আমার।' বললাম, 'তুমি কি দুর্গাপুরে যাবে ? কিন্তু ছোটকু মামা—।' বলল, 'জানি। তবু একবার যাই।' বীণাদি চলে গেল।

পরদিন স্কুল থেকে এসে দেখি মামা ড্রইংরুমে পুলিশ সার্জেণ্টের সঙ্গে কথা বলছেন। অফিস থেকে চলে এসেছেন, বোঝা যাচ্ছে। বীণাদির লাস পাওয়া গেছে কালীঘাট স্টেশনের কাছে। রেল-লাইনের ধারে। আর পাওয়া গেছে ছোট একটা সুটকেসে ঘুমের ওষুধের শিশি, এ বাড়ির ঠিকানা আর দুর্গাপুরের ইঞ্জিনীয়ার শরদিন্দু চক্রবর্তীর ঠিকানা। পুলিশ অফিসার বলছিলেন, 'যা বলেছেন মিঃ রায়, আমাদের হয়েছে যত বিপদ ! এককাঁড়ি মাইনে দিয়ে এদের রাখব, খাওয়াব, তারপব এটা দাও সেটা দাও—শেষকালে এইরকম নিমকহারামি করবে এরা।' আর শুনলাম না—চলে এলাম দোতলায়। পেছনের বারান্দায় বীণাদির একটা নীলপাড় শাড়ী তখনও শুকোচ্ছিল। আমি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। কান্নাটা বোধহয় ছোঁয়াচে। তুমিও কেঁদে উঠলে। মামী কোথা থেকে তাড়াতাড়ি এসে বললেন, 'চুপ কর তোরা, এত আদিখ্যেতে ভাল নয়।'

আমার ওপরই ভার পড়ল চা ইত্যাদি তৈরী করার। মামা-মামীর জন্য ট্রে করে চা নিয়ে ওঁদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থামলাম। মামা বলছেন, 'তোমার ভাই বলে সে একেবারে ভীষ্মদেব না ! কতবার বলেছি এ বাড়িতে রাত কাটানোটা এনকারেজ কোর না। তা তখন কথায় যেন বিষ ঝরে পড়ত তোমার।' 'নিজের মত সকলকে ভাবো নাকি ?' 'জানি সারাজীবন আমার ঐ একটা ভুলের জন্য তোমার কাছে আমার নিষ্কৃতি নেই। তবু এই লম্পট ডি. কে. রায়ের জন্যই তোমার ঐ লালটু ভাই বেঁচে গেল, বুঝলে ?' মামী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'আমি এখনো বিশ্বাস করি না। ছোটকু !' 'থাম, থাম ! একটা নিরীহ মেয়ে—!' মামীর কণ্ঠ আবার তীক্ষ্ণ হল, 'ওঃ দরদ যে উথলে উঠছে, ব্যাপার কি ?' মামা গর্জন করে উঠলেন, 'থাম ! মাসতিনেক আগেই আমি বলিনি, ছোটকুর আসা বন্ধ করতে না চাও, বীণাকে কাজ থেকে জবাব দাও ? না, বীণা না হলে আমার

সংসারই চলবে না। এখন সে তো কলা দেখিয়ে চলে গেল—' কে ? কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?' বললাম, 'মামা, আমি চা এনেছি।' মামী আমার দিকে তাকালেন না। মামী কাঁদছিলেন।

রাত্রে আবার অনেকদিন পর তোমার ঘরে শুতে গেলাম। মামী বলেছিলেন তোমাদের কারুরই আজ একা একা শোওয়া উচিত নয়। বীণাদির কথা ভাবতে ভাবতে কাঁদতে কাঁদতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা গুমরে গুমরে কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তুমি কাঁদছিলে। আমি তোমার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অনুদি, তুমি বীণাদির জন্য কাঁদছ ?' তুমি হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'শঙ্কু, আমি মরতে চাই না— আমি মরতে পারব না।' তুমি আমাকে যত বড় মনে করে যত কথা বলতে লাগলে তখনও আমি ঠিক তত বড় হইনি। সেদিন তুমি বড্ড ভয় পেয়েছিলে। হিস্টিরিক্যাল হয়ে গিয়েছিলে। আমি মামীকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। তুমি আমাকে আঁকড়ে ধরে রইলে। তারপর হঠাৎই তোমার ঘুম-চোখ হিংস্র হয়ে উঠল, 'মাকে যদি কিছু বলিস তোকে আমি খুন করে ফেলব শঙ্কু !' তারপর আবার হঠাৎই দুর্বল হয়ে শুয়ে পড়লে। বললে, 'শোন শঙ্কু, ঐ ড্রয়ারটায় কতগুলো ট্যাবলেট আছে, একটা দে তো।' ভয় পেয়ে বললাম, 'কি ট্যাবলেট ?' তুমি অদ্ভুত করে হেসে বললে, 'ভয় নেই, ট্র্যাঙ্কুইলাইজার। খেলে ঘুম হয়। আর কিছু নয়। তুইও খা না একটা, নাহলে হয়তো তোরও ঘুম হবে না।' আমি খাইনি। তুমি আবার বললে, 'শঙ্কু, তুই আমার পাশে আমাকে জড়িয়ে ধরে শো, আমার ভীষণ ভয় করছে।' তোমার কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। হেসে বললে, 'ভয় পাসনি, এই ওষুধটা খেলে এইরকম হয়। কাল সকালে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাত্র চারটে দিন আমাকে জীবন সম্পর্কে কত বেশী অভিজ্ঞ করে দিয়ে গেল, সতর্ক করে দিল, কোথায় যেন একটা ঘেন্নাও ধরিয়ে দিয়ে গেল। বীণাদির জন্য কাঁদতে গেলাম, কান্না এল না। খুব শোকেও মনটার নরম জায়গাতে একটা ঘা না লাগলে তো কান্নাও আসে না—কাঁদতে গেলেও তো একটা বিশ্বাস কোথাও থাকা চাই। সেই নরম জায়গা, সেই বিশ্বাসই বুঝি সেদিন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল আমার। বীণাদি বলেছিল, 'তুমি বুঝবে না শঙ্কু, আরও বড় হও, যদি কাউকে ভালবাস তাহলে বুঝবে—তাকে অমান্য করা যায় না।' তুমি বলে- ছিলে, 'কোন বিশেষ একজন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি—মাঃ, তুই আর একটু বড়

হ, তাহলে বুঝবি ! তাছাড়া ঐসব বস্তাপচা সতীত্বতে আমি বিশ্বাস করি না।'

বীণাদির দুর্ভাগ্য তোমার হয়নি। ক'দিন পর প্রমাণ হয়েছিল তুমি নিরাপদ। মনে আছে, একদিন তুমি আমাকে প্রায় জেরা শুরু করে দিলে, সেদিন রাতে তুমি আমাকে ঠিক কি কি বলেছিলে ? কোন নাম বলেছিলে কিনা ইত্যাদি। আমিও তোমার মনের মত উত্তর দিয়েছিলাম—ওটা তো স্বপ্ন হয়েই ছিল। কাজেই তোমাদের ক্লাবের যে নামটা সেদিন তুমি বলেছিলে আমি উচ্চারণ করিনি। কিন্তু তুমি আমার উপর রেগে রইলে। একদিন আবার ঐরকম ঘুমের বড়ি খেয়ে বললে, 'কেন সেদিন তুই আমার ঘরে ঘুমোতে এলি ? তবে তোকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তোকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। বেরিয়ে যা—আমার ঘরে তোকে ঘুমোতে হবে না।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খাবারঘরের মেঝেতে আবার বিছানা করলাম। মাঝরাতে তুমি আবার আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, 'শঙ্কু আমার ভয় করছে, এ ঘরে আয়।'

সেবার তোমার টেস্ট। তুমি ফেল করলে। কিন্তু ফেল করবার মত মেয়ে তো সত্যি তুমি ছিলে না। মামা বললেন, 'বীণাটা সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে। মেণ্টাল শকে এটা হ'ল।' মামী বললেন, 'বাইরে ঐরকম রুক্ষ। ভেতরে ওর মনটা খুব নরম তো।'

তিনজন টিউটর ঠিক হোল তোমাকে পড়াবার জন্য। বাংলা পড়াবার একজন, পলিটিক্যাল সায়েন্সের একজন, আর ম্যাথসের একজন।

মেরিন ড্রাইভের এই হোটেলটা থেকে হোটেলেরই কাগজে তোমাকে চিঠি লিখছি। নীচে ডাইনিং হলে নাচ ক্যাবারে না স্ট্রিপটিজ কি সব যেন হচ্ছে। মনে আছে, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতার এক হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলে ? বাড়ি ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'কেমন লাগল ? দারুণ এক্সাইটিং না ?' বলেছিলাম—'অসহ্য ! কি করে তাকিয়ে থাকে সবাই ঐদিকে ?' তুমি আমার গালে মৃদু চড় মেরে বলেছিলে, 'গাঁইয়া।' সে তো খুব বেশীদিন আগের কথাও নয়, তাই না ? আজ ওসব নাচটাচ শুরু হবার আগেই আমরা ওপরে চলে এসেছি। আমি আর আমার স্বামী। ও পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। আমি এই বসবার ঘরটায় বসে তোমাকে চিঠি লিখছি। হোটেলের নামটা দেখে চমকে উঠেছিলে তো ? ভাবছ, 'হাও কাম শঙ্কু ইজ দেয়ার ?' মাত্র একদিনের জন্যই এখানে আসতে—বলতে পার, বাধ্য হয়েছি। ঈর্ষা করার মত ব্যাপার কিছু নয়।

সমুদ্রের ঢেউগুলো বিরামহীন ভাবে আছড়াচ্ছে। কান পেতে থাকলে মনে

হয় কলকাতার, তাই বা বলি কেন—সারা পৃথিবীর এই তালকানা খুনোখুনি আর অশান্তির মধ্যে কোথাও যেন একটা ছন্দ রচনা হয়েই চলেছে। নাঃ, যত কথা মনে আসছে সব লিখতে গেলে এ চিঠি আর শেষ হবে না। চিঠিটা শেষ করা দরকার।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, তোমার তিনজন টিউটর এলেন। বাংলার মাস্টার রাজচন্দ্র মণ্ডলের কথা একটু বলি। বাংলা ও দর্শনের ডবল এম. এ.। প্রথমদিন নাম শুনে তুমি বলে উঠলে, 'বাব্বাঃ কি বিচ্ছিরি নাম, শুনলেই কেমন ছোটলোক ছোট-লোক লাগে!' সেই প্রথম মামাকে ধমক দিতে শুনেছিলাম।—'আঃ অনু, মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখো। আজকালকার ছেলেমেয়ে তোমরা অনেক সংস্কার মানো না বলে গর্ববোধ করে থাক, তবে এ সংস্কার কেন?' তারপর জেনেছিলাম, ম্যাট্রিকুলেশন থেকে জলপানি পেয়ে পেয়েই এম.এ. পাশ করেছিল রাজচন্দ্র মণ্ডল। কিন্তু বেচারীর ভাল চাকরি জোটেনি কপালে। শহরতলীর এক অখ্যাত কলেজের লেকচারার।

বাড়িতে আবার তটস্থ ভাব শুরু হয়ে গেছে। বীণাদির বদলে নতুন ঝি এল মানিকের মা। অনেক কাজের লোকের পরীক্ষার পর দেখেশুনে এই শক্তসামর্থ্য প্রৌঢ়া মহিলাকে খুঁজে বার করেছিলেন মামী। বীণাদির চাইতে মাইনে দশটাকা বেশী। পানজর্দার খরচ চাই। তেল-সাবান—আরও যে কত বায়না। মামী আমাকে বললেন, 'তবু শুকু একটা বাঁচোয়া, প্রেম-প্রেম বাই থাকবে না।' মাণিকের মায়ের সঙ্গেও দেখলাম তোমার বেশ জমে গেল। মানিকের মাও বুঝে গেল, এ বাড়িতে সর্বপ্রথম কাকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার। কেন জানি না, প্রথমদিকে রাজচন্দ্রকে নাকাল করার ইচ্ছে প্রচণ্ডভাবে পেয়ে বসেছিল তোমাকে। আমি আজও অবাক হয়ে ভাবি, অপরকে বেইজ্জত করে নাকাল করে কি আনন্দ তুমি পাও? মনে আছে, একদিন একটা সুন্দর দামী কাচের ডিশে দোকান থেকে কিনে আনা নিমকি সিঙ্গাড়া সাজিয়ে রাজচন্দ্রের সামনে রাখল মানিকের মা? একপাশে কাঁটা, আর একপাশে ছুরি। যদিও একটা অলিখিত নিয়ম ছিল—তোমার পড়ার ঘরে আমার না থাকার। আমার একটা জরুরী বই ঐ ঘরে থাকাতে যেতেই হয়েছিল। আমি আড়চোখে দেখলাম মানিকের মা'র কাণ্ড। ভাবলাম, কি বোকা! সিঙ্গাড়া নিমকির সঙ্গে ছুরিকাঁটা দিয়েছে? তুমি বললে, 'কই খান মাস্টার মশায়!' রাজচন্দ্র ছুরিকাঁটা দিয়ে সিঙ্গাড়া কাটতে গেল। প্লেট উঠল লাফিয়ে। সিঙ্গাড়া নিমকি সঙ্গে নিয়ে প্লেট পড়ল মেঝেয়। একখানা প্লেট হল তিনখানা—নিমকি

সিঙ্গাড়ার হল হরির লুট। রাজচন্দ্র ছুরিকাঁটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ভাঙা প্লেটটার দিকে। সে লজ্জিত মুখ আমি কোনদিন ভুলব না। তুমি খুব সমবেদনার সঙ্গে বললে, 'তাতে কি হয়েছে? লজ্জা পাবার কিছু নেই। অভ্যেস না থাকলে ওরকম হয়। মানিকের মা—' ডাকতে ডাকতে তুমি বাইরে চলে গেলে।

আমার কেমন খটকা লাগল। 'অভ্যেস না থাকলে'—মানে? তুমি তো জানতে অনুদি যে, সিঙ্গাড়া নিমকি কাঁটাছুরি দিয়ে খাওয়া যায় না। তুমিও পারতে না—কেউ পারে না। লজ্জিত ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জা ঢাকবার জন্য আমাকেই বলে বসলেন, 'দেখুন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আপনাদের অনেক দামী একটা প্লেট নষ্ট করে ফেললাম।' আমি বললাম, 'ছুরিকাঁটা দুটো রেখে দিন।' ভদ্রলোক ত্রস্তে রেখে দিলেন ওগুলো। বেরিয়ে করিডোরে এসে দেখলাম এক কোণে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছ তুমি আর মানিকের মা। আর একবার নাকি—আমার পরে শোনা—তুমি রাজচন্দ্রকে বলেছিলে, দুশোটা টাকা তোমার যেমন করে হোক চাই-ই। মা-বাবাকে বলা যাবে না। তাহলে নাকি তারা তোমাকে কেটে ফেলবেন। হায়রে কে কাকে কাটে! সেই টাকাটা যোগাড় করতে বেচারীকে যে কি করতে হয়েছিল—কিন্তু তোমার কাছে প্রেস্টিজ রাখতে হবে তো!

আমাদের নিম্নমধ্যবিত্তদের এই হীনমন্যতা আমাদের আরও বেচারা আর করুণ করে তোলে। রাজচন্দ্র ভেবেছিল ছুরিকাঁটা দিয়ে নিমকি সিঙ্গাড়া না খেতে পারলে তুমি বোধহয় ওকে গেঁয়ো আর বোকা ভাববে। বোকা গেঁয়ো ভেবেছিলে বলেই যে ব্যাপারটা ঘটিয়েছিলে, সেটা ওর মাথায় ঢোকেনি।

আমার আজ এই হোটেলে থাকার কারণটার দিকে যাওয়া যাক। পূর্বাদির সঙ্গে দেখা নেই বহুদিন। ও কলেজে চলে যাওয়ার পর থেকেই সংযোগ কমে এসেছিল। বছর তিনেক আগে বিডন্ স্কোয়ারে নাট্যোৎসবে এক নাটক দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখা। পূর্বাদির বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমারও যেন এত খুশী বহুদিন লাগেনি। কত কথা যেন বলার আছে, শোনার আছে। রইল পরে নাটক দেখা। চলে গেলাম পূর্বাদির বাড়ি। আর সেদিনই আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

পূর্বাদির বাবা মারা গেছেন। পূর্বাদিরা একটা গোপন সমিতি করেছে। পূর্বাদির দাদাই তার নেতা। রমেশ চৌধুরী। রমেশ চৌধুরীর নাম মনে পড়ছে

না? গত বছরই তো পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মারা গেলেন জলপাইগুড়ি স্টেশন-এর কাছে। কাগজে খুব বড় বড় করে খবরটা বেরিয়েছিল। অবশ্য তোমার স্টেট্স্ম্যানের পারসন্যাল কলাম বা সিনেমা পত্রিকা বা সামাজিক কেচ্ছার খবর ছাড়া আর কোন্ খবরই বা ভাল লাগে? সেদিন পূর্বাদি আমাকে ছোটখাটো একটা লেকচারই দিয়ে দিল। মনে হল আমি যেন অনেক নতুন কথা শুনছি। জানা কথাগুলোরই যেন এক নতুন মানে হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা মানে কি চাই যেন আমি জানতাম না। শোষক, শোষিত, ব্ল্যাকমানি, ফরেইন মানি—আরও কত কি! যাকগে, এসব আজকের চিঠির প্রসঙ্গে অবান্তর। মোটকথা আমার নতুন চেতনা হল। আমার আবছা ধারণাগুলো একটা পরিপূর্ণ রূপ পেল। মেতে উঠলাম ঐ কাজ নিয়ে। এই গুপ্ত কাজের কেমন একটা নেশা আছে। গুপ্ত বলেই যেন খুব ইম্পরট্যাণ্ট—আর সেখানেই ঘটল আর একটা ইম্পরট্যাণ্ট ব্যাপার। সেখানে রাজচন্দ্রের সঙ্গে আমার দেখা। সেই পরিবেশে দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক। পূর্বাদি একসময় আমাকে বললে, অল্পদিন হল এসেছে। মানুষটা খাঁটি কিন্তু দুর্বল, বড্ড রোমাণ্টিক। ওকে একটু সবল করা দরকার। তুই একটু ভার নিতে পারিস? কিন্তু দেখিস, ঐ ন্যাকামী ধরণের প্রেম করে বসিস না। মনে রেখো আগে পার্টির কাজ, তারপর আর সব। কাজের এতটুকু ক্ষতি কিন্তু পার্টি সইবে না।

একদিন দেখি লোকটাকে ভাল লেগে গেছে। পূর্বাদি বা রমেশদা যতই বলুক—কেমন করে যে কাজে ফাঁকি শুরু হল বুঝতে পারিনি। রাজকে নিয়ে যেতে লাগলাম রেস্টুরেণ্টে বা কোন ফাঁকা জায়গায়। স্রেফ গল্প করার জন্য। আর তখনই শুনলাম তুমি নাকি এমন ভাব দেখিয়েছ যে তুমি রাজচন্দ্রকে ভালবাস। মনে পড়ল—তখনই তো কিছুদিন তুমি ওকে নিয়ে হোটেল-টোটেলে গিয়েছিলে নাচ দেখতে, তাই না? একদিন ওকে চুমুও খেয়েছিলে, তাই না? প্রথম দিকে ও যে পার্টির কাজে ফাঁকি দিত সে তোমারই জন্য। সপ্তাহে তোমাকে তিনদিন পড়াবার কথা, কিন্তু তোমার অনুরোধে কত সপ্তাহে যে তোমাকে পাঁচ দিন পর্যন্ত পড়িয়েছে! এসব কথা শুনে আমি চমকে উঠে ভেবেছিলাম, তোমার হাত থেকে ওকে বাঁচাতে হবে। ও তোমার নয়—ও আমার। আমার এ প্রচণ্ড আবেগের আবির্ভাব নিয়ে সে আমার কি লজ্জা! আমি তো জানতাম তুমি ওকে নিয়ে দুদিন খেলা করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—যেমন দিয়েছিলে তোমাদের সমাজের সেই সঞ্জয়কে। যে বলত—'আই হেট টু স্পিক বেঙ্গলি!'

ভাবলাম চিরকাল তো তোমার দেওয়া সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিস নিয়ে জীবন কেটেছে, রাজকে আর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হতে দিই কেন? কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম—রাজ তোমাকে ভালবাসে—ভাল না বাসলেও রাজ তখন তোমার রূপে তোমার ভঙ্গীতে তোমার চুম্বনের গন্ধে পাগল, অস্থির। পূর্বাদির প্রেমে আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাই নিয়ে পাগলামিতে কি ভয়ানক যে আপত্তি! পূর্বাদির কথা অমান্য করে, তোমার হাত থেকে রাজকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রকৃতির দেওয়া সমস্ত তন্ত্র কাজে লাগালাম। সবচেয়ে কাজে লেগেছিল আমার লক্ষ্মীট্যারা চোখ। দেখলাম তোমার প্রতি রাজের মোহ কাটল। এদিকে ততদিনে গুপ্ত সমিতির কাজে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। কিন্তু ভাল লাগছিল না। এত খুনোখুনি, এত অবিশ্বাস! তারপর যেদিন কথা হল রাজকে এ্যাকশান স্কোয়াডে যেতে হবে, সেদিন আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠল। মনে মনে চীৎকার করে উঠলাম—না, তা হবে না। একবার ওর হাত রক্তে রাঙা হলে—। আর কাকে মারতে হবে, আমাদেরই দলের একটি হাসিখুশী ছেলে—যে পোস্টার লেখায় অদ্বিতীয়! সে নাকি পুলিশের স্পাই হয়ে গেছে। এতবড় একটা আদর্শের মধ্যে এমন ছোট চিন্তা—আমাকে প্রায় অসুস্থ করে তুলল। রাজকে বারণ করলাম যেতে। রাজেরও এসব ভাল লাগছিল না। আমরা দুজনেই হয়তো ঐ ধাতুতে গড়া নই।

পূর্বাদি একথা শুনে যেন জ্বলে উঠল। বুঝলাম আমাদেরও দিন ফুরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে তুমি বি. এ. পাশ করেছ অনার্স পেয়ে। মামা বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন। আর সেই খুশীর পার্টিতে আনন্দ করতে গিয়েই মামা হার্ট এ্যাটাকে মারা গেলেন। সেদিনও সেই পার্টিতে তোমার রাজকে নিয়ে কি উচ্ছ্বাস—না, কি ফ্লার্টিং! কারণ তারই মধ্যে ন্যাশনাল পিয়ার্স কোম্পানীর ব্যাচেলার ডাইরেক্টরের দিকে তেরছা দৃষ্টি ছুঁড়ে দেবার কথাও তো ভুলতে পারছি না। তোমার সব জিনিসই একটু বেশী বেশী চাই, তাই না?

মামা মারা যাবার পর তোমরা আমাকে স্পষ্টই বাড়ি থেকে চলে যেতে বললে। উঠে এলাম বিডন স্ট্রীটের মেয়েদের হোস্টেলে। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, রাজের বদলে সেদিন পূর্বাদিই এ্যাকশানে গিয়েছিল। তার পরদিন পূর্বাদিকে দেখেছিলাম। এ পূর্বাদিকে যেন আমি চিনি না। পূর্বাদির বাবার কথা মনে করে কেঁদে ফেলেছিলাম আমি। পূর্বাদি বলেছিল, 'শোন শুকু, বুঝতে পারছি এ পথে তোরা অচল—আমি কিছু না বললেও দল তোদের ক্ষমা করবে না।'

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। এম. এ. পরীক্ষা দেবার সময়েই 'শুকতারা' বদলে বাপ-মার দেওয়া নামটা ফিরিয়ে এনেছিলাম। রাজও নিজের নাম বদলেছে, মানে বদলাতে হয়েছে। হ্যাঁ, রাজচন্দ্রকেই বিয়ে করেছি আমি। আমরা কাল বিদেশে যাচ্ছি। সন্ধ্যের ফ্লাইটে। এত টাকা কোথায় পেলাম ? রাজের মা ওঁর বর্ধমানের সেই ছোট বাড়িটা বাঁধা রেখে দিয়েছেন। দুজনেই বিদেশে রিসার্চ করব। একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই মাকেও নিয়ে যাব। ওঃ হ্যাঁ, একটা কথা শুনলে হয়তো তোমার ভাল লাগবে—আমরা যখন বেরিয়ে আসছি ডাইনিং হল থেকে, দেখি ছোটকুমামা তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীকে নিয়ে নাচ দেখতে আর খাওয়া সারতে যাচ্ছেন। স্ত্রীর বেনিফিটে সস্নেহ মামার ভূমিকায় কি চমৎকার অভিনয় করলেন! আমার ডবল প্রমোশনের গপ্পোটা রসিয়ে রসিয়ে বললেন। কেন কে জানে, আমার বীণাদির কথা মনে পড়ছিল।

হৈমন্তীদি একদিন তোমাকে সস্নেহে বলেছিল, 'ওঃ অনসুয়া, তোর নামের দন্ত 'ন' আমি বাদ দিয়ে দেব। এবার থেকে তোকে অসুয়া বলব।'—মনে পড়ে ?

সেই থেকে আমারও মাথায় ঢুকে গিয়েছিল—আড়ালে মাঝে মাঝে তোমাকে অসুয়াদিই বলতাম। মনেও হত, তোমার মধ্যে ঐ রিপুটা বড্ড বেশী। কিন্তু এই ভোরের মুহূর্তে পর্দা সরিয়ে মনটা কেমন উদার হয়ে গেল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। ও ঘরে গিয়ে দেখি রাজ এখনও ঘুমুচ্ছে। ঘুমোলে ওকে এমন বাচ্চার মত দেখায়!

অনুদি, বিদেশে পৌঁছে তোমাকে চিঠি দেব। মামার সম্পত্তি নিয়ে তুমি আর মামী যে মামলা করছ—কে জিতল জানার কৌতুহল দেখছি এখনও আমার আছে।—

…একটু আগে খবরের কাগজে কলকাতার খবরে দেখলাম, পূর্বাদির ফাঁসির হুকুম হয়েছে। পূর্বাদি রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেছে। সেটাই তো স্বাভাবিক ওর পক্ষে। কিছুদিন আগেই জেনেছিলাম পূর্বাদি আর তার বৌদি ধরা পড়েছে। সকালের সেই উদার আনন্দ আর এখন আমার নেই। একটা অসহ্য কষ্টে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। রাজ কিছু খায়নি, তাই আমিও খাইনি। হয়তো উপোসে থেকেই প্লেন ধরব। হয়তো কোনদিন প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু কোন্ পথে আমি জানি না। অনুদি, সব বলার পরও বলি—তোমাদের ঐ বাড়িটাকে, তোমাকে—আমি সত্যি ভালবেসে ফেলেছিলাম।

ইতি—শকুন্তলা (শুকু)
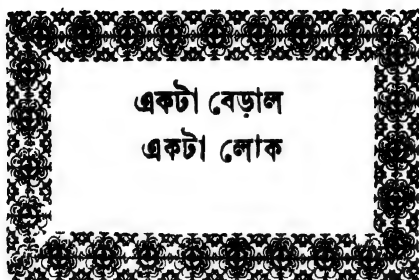
শৌর্যেন্দ্রবাবু আজ আপিসফেরতা বড় রাস্তার মোড়ের মিষ্টির দোকান থেকে এক টাকা দামের দুটো সন্দেশ কিনলেন। একটা তিনি খাবেন! আর একটা বিলু। এঃ, ওটি করতে গিয়ে বেশ রাত হয়েছে! প্রায় ন'টা বাজে। তাঁর গলির মোড়ে আসতেই দেখেন, বেশ একটা ছোটখাটো ভীড়। কানে এল—'এঃ, একেবারে থেঁতলে গেছে—কে চাপা পড়ল?' এ পাড়াব বিশ-বাইশ বছরের বাসিন্দা তিনি। চিনবেন নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি এসে উঁকি দেবার চেষ্টা করলেন।

কে একজন বললে, 'ঐ তো সূর্য্যকাকা এসে গেছে। যার জিনিস সে বুঝে নিক, আমাদের কি?' আর একজন বললে, 'দেখুন তো, এটা আপনার বিলু নয়?' হ্যাঁ, তাঁর বিলুই তো! কোমরটা প্রায় চেপ্টে গেছে। সাদা দেহে কানের পাশে দুটো বড় কালো ছাপ, আর ঠিক মাথার মধ্যিখানে কালো তিলকের মত দাগ দেখে বুঝলেন বিলু।

তাঁর নীচের ফ্ল্যাটের মন্টু—নীরোদবাবুর ছেলে বললে, 'দু মিনিটও হয়নি, একটা প্রাইভেট চাপা দিয়ে চলে গেল। আমি দেখেই বললাম, এটা সূর্য্যকাকাব বেড়াল—বিলু! সত্যি খুব ভালবাসতেন আপনি বেড়ালটাকে—আচ্ছা যাই।'

শৌর্যেন্দ্র বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন বিলুর দিকে। বিলুর চোখ দুটিও বিস্ফারিত। তাঁর দশ বছরের সঙ্গী! চোখে জল এল। কতবার রোগ-ভোগ, এ্যাকসিডেণ্ট থেকে এই বিলুকে বাঁচিয়েছেন তিনি—আর আজ—উঃ! হঠাৎ দেখলেন তাঁর চারপাশে কেউ নেই। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কি করবেন

এখন ? রাস্তায় এইভাবে বিলুকে ফেলে তো যেতে পারেন না ? উপায় ? প্রথম ঝড়জলের রাতে যেদিন আশ্রয় চাইতে এসেছিল বিলু, সেই অদ্ভুত করুণ চোখ এই বিস্ফারিত চোখের সঙ্গে মিলে গিয়ে যেন বললে, 'আমাকে ফেলে যাবে ?' কাদা থেকে কোলে তুলে নিলেন তিনি বিলুকে।

চায়ের দোকানের ফাঁকে ছোঁড়াটা বললে, 'দেখ দেখ কালোদা, বুড়োর কাণ্ড ! মড়া বেড়ালটাকে বাড়ি নিয়ে চলল নাকি ?'

—'ছেড়ে দে, সুয্যিদার মাথায় ছিট আছে।' ঐ কালোদা বলল বোধহয়।

বুড়ো ? হ্যাঁ, দশ বারো বছরের ছেলের কাছে তিনি বুড়ো বইকি, কত বয়স হল তাঁর—আটচল্লিশ ? পঞ্চাশ ? যাই হোক, চুল তো সব সাদা হয়ে গেছে। সেই যেবার মল্লিকা—। বিলুর দেহ নিয়ে চললেন তিনি কালীঘাটের গঙ্গার দিকে। কতটুকুই বা পথ ! লোডশেডিং হল। হাল্কা মেঘের ফাঁক দিয়ে চতুর্দশীর জ্যোৎস্নায় রাস্তা দেখা যায়।

এই বেড়ালটাকে ভালোবাসতেন বলে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই ঠাট্টা করত। বড়দি তো একদিন বলেই বসল বিরক্ত হয়ে, 'তোর বেড়াল যদ্দিন থাকবে আমি আর আসব না।' এসে পড়েছেন—আদিগঙ্গার সামান্য নোংরা জল চাঁদের আলোয় অসামান্য হয়ে উঠেছে। নাঃ, বিলুকে এমনি ফেলে দেবেন না। কাদা সরিয়ে মাটি চাপা দেবেন। বড় নির্জন—আবার মস্তানদের হাতে পড়বেন না তো ? ঠিক তাই—একটু দূরে কাঠগুদামটার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে কয়েকটা ছেলে—নাঃ, মেয়েও তো আছে সঙ্গে—মদটদ খাচ্ছিল বোধহয় —'কে, কে রে' ! গর্জন করে অকথ্য গালি দিয়ে দুজন এগিয়ে এল। মারে আর কি। হঠাৎই একটি ছেলে বলে ফেললে, 'আরে এ যে আমাদের সুয্যিকাকা !'

শৌর্য উচ্চারণ করা বড় শক্ত। তাই পাড়ায় তিনি সুয্যি হয়ে গেছেন। এখন তাঁর নিজেরও কেউ সুয্যিদা বা কাকা বললে বেশ আপন লাগে।

—'আপনার হাতে কি ? ওঃ, সেই বেড়াল মরে গেছে ?'

আবছা মনে পড়ল শৌর্যেন্দ্রর, ভোটের সময় কোন একটা পার্টির হয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিল যেন ছেলেটি।…যাই হোকগে—মরুকগে। ওরাই তাড়াতাড়ি বিলুর কবর দিয়ে দিল। চলে আসছেন—জড়ানো গলায় পালের গোদা বললে, 'আমাদের লেবার-চার্জটা দেবেন না দাদা ?'

শৌর্য তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে কুড়িটা টাকা আর খুচরো সব দিলেন

ওদের হাতে। কে একজন ঘড়িটা চাইল, সেই ভাইপো বাধা দিল।

—'এসব কথা আবার পুলিশকে বলবেন না কাকা।'

শৌর্য বললেন, 'না, না।' মনে মনে বললেন, 'আগে যেমন একাদশীতে বিধবার মাছ খাওয়া বারণ ছিল, এযুগে এসব কথা পুলিশকে বলা তেমনি বারণ—তা কি তিনি জানেন না?'

শূন্য হাতে ফিরে এলেন নিজের ফ্ল্যাটে। শূন্য বাড়ি। কত ইতিহাসই রচনা করলে এই ফ্ল্যাট। তাঁর মত অতি সাধারণ লোক—তবু সময় ইতিহাস রচনা করে, দেয়ালগুলো জানে। বড় ময়লা পড়েছে দেয়ালে, ছাতে। চুনকাম হয়নি অনেকদিন। থাকগে, আর ক'দিনই বা বাঁচবেন? একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়া যাক আজ—মল্লিকা চলে যাবার পর মদ ধরেছিলেন তিনি। একদিন মাতাল হবার পর ঘেন্নায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। একটা বোতল এখনও আলমারিতে আছে। বার করা যাক। হেসে ফেললেন, মল্লিকার শোক আর বিলুর শোক কি এক হয়ে গেল? বিলু—বিল্লি, বেড়ালটা ছাড়া আর কেই বা ছিল বা আছে তাঁর? কেন, তোমার ভাইঝি চন্দ্রিমা? চাঁদু—মেস ছেড়ে যার জন্য এই ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হয়েছিল তোমাকে, আজ থেকে বাইশ বছর আগে।...অনেকদিন চাঁদুর খবর পাননি। ওরা তো আর আমার খবর নেয় না। কলকাতা বেড়াবার শখ হলে আসে। তখন অবশ্য একটা ধুতিও কিনে দেয় তাঁকে।

ঐ চন্দ্রিমাকে নিয়েই এই ফ্ল্যাটের সংসার শুরু। দাদা-বৌদি কাশ্মীরে এ্যাকসিডেণ্টে মারা যায়। যদিও তাঁর লেখাপড়ায় বা চাকরির ব্যাপারে দাদা বৌদি সব সময়ই বলত—'স্বাবলম্বী হও। নিজের পায়ে দাঁড়াও।' ভাগ্যিস তাঁর সেই মনের জোর আর মেধা ছিল। তাই ভালভাবে পাশ করা আর মোটামুটি একটা ভাল চাকরি তিনি জুটিয়ে নিতে পেরেছিলেন। একদিন আপিস থেকে মেসে ফিরে দেখেন, চাঁদুর ছোটমাসী অর্থাৎ বৌদির ছোটবোন চাঁদুকে মেসে রেখে গেছেন এবং বলে গেছেন, 'পৃথিবীতে সবচাইতে আপনার এখন তোমার কাকা। তাঁর কাছেই তুমি থাকবে।' মেসের ঝি দুর্গাদিদি তাই বললে। আর এগার বছরের চাঁদু ছোট একটা সুটকেস হাতে করে অদ্ভুত এক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে, যে চোখ দেখলে নিজের চোখে জল আসে।

তারপর এই ফ্ল্যাট ভাড়া করা, দূর-সম্পর্কের ঠাকুমাকে খুঁজে নিয়ে আসা, ঝি রাখা, চাঁদুকে স্কুলে পাঠানো।

স্কুল ফাইনাল পাশ করল চাঁদু উনিশ বছর বয়সে। আর তারপরেই ঘোষণা

করলে সে বিয়ে করবে। হাবুল পাত্র ভাল। সবে তখন চাকরি পেয়েছে। বিহারে বাস করে তারা। তা ভালভাবেই বিয়ে দিয়েছিলেন। চাঁদুকে গয়না, হাবুলকে আংটি, ঘড়ি কিছুই বাদ যায়নি। তারপর সেই ঠাকুমা সঙ্গে গেলেন। ঝি চলে গেল। একটা চাকর রেখেছিলেন—একদিন সে সর্বস্ব চুরি করে পালিয়ে গেল।

ছন্নছাড়া জীবন। বাড়িতে চা ছাড়া আর কিছুই খান না। হোটেলে এখানে-ওখানে খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো। সেই সময় বঙ্গসংস্কৃতির মেলায় দেখা হল মল্লিকার সঙ্গে। মেয়েটা ফুচ্‌কা খাচ্ছিল আর একটা মেয়ের সঙ্গে। হঠাৎ বলে উঠল, 'আরও খেতে ইচ্ছে করছে রে টিংকু, কিন্তু পকেট একেবারে গড়ের মাঠ!'

টিংকু বলে উঠল, 'ব্যাগ বল!'

হঠাৎ শৌর্যেন্দ্রর যে কি হল। বলে বসলেন, 'খান না যত ইচ্ছে, আমি স্ট্যান্ড করব।'

বয়স তখন তাঁর আটত্রিশ। ঐ বয়সে—। মুহূর্ত-পরেই মল্লিকা বলেছিল, 'তাহলে আপনাকেও আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।'

বেঁচে গিয়েছিলেন উনি। ফুচ্‌কা খেতে যে এত ভাল লাগবে কে জানত।

যখন মল্লিকাময় হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন, তখনই একদিন ঝড়বৃষ্টির রাতে একটা কুঁই-কুঁই শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখেন, একটা বেড়াল-বাচ্চা জলে ভিজে কাঁপছে। তাঁকে দেখে এমন করে তাকাল, এত করুণ সে দৃষ্টি—যেন বলছে, 'আমাকে একটু বাঁচতে দাও।' চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল বুঝি চাঁদুর কথা। তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে টিনের দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিলেন বেড়ালটাকে। দুধ খেয়ে বেড়ালটা এমন করে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে—যেন বলছে, 'ইউ আর মাই সেভিয়র।'

হাসি পেল, এসবই তার কল্পনা। কোন বেড়াল এমন করে ভাবতে পারে? দু'দিন তো আপিসই যাননি। দুধ খাওয়ানো, তোয়ালে জড়িয়ে ঘুম পাড়ানো। আপিসের সহকর্মীরা তাঁর দু'দিনের অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছিল। ম্যানেজার নাকি বলেছিলেন, 'তেমন দেখলে একটা নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করে দিও। বেচারার তিনকুলে কেউ নেই।'

খোঁজ নিতে এসে শৌর্যকে বেড়াল কোলে পায়চারি করতে দেখে তারা হাসবে, না কাঁদবে ভেবে পায়নি। সেই বিলু গাড়িচাপা—নাঃ, ভাবা যায় না।

যখন বিলু এল, পাশের ফ্ল্যাটের পাঞ্জাবীদের বাচ্চাগুলোর মহা উৎসাহ

হয়েছিল—'আংকল বিল্লি লায়া হ্যায়' করতে করতে ওরাই ওর নামকরণ করে দিয়েছিল বিল্লু। তার থেকে বিলু। বিলু বলে ডাকলে মিঁউ মিঁউ করে সাড়াও দিত। বাধ্য হয়েই আবার ঠিকে-ঝি রাখলেন, যে একটু দুধ গরম করে দেবে ওর জন্য বা মাছটাছ সেদ্ধ। আর সেই যে দু'দিন বাড়ি থেকে বার হননি, তার জন্য মল্লিকার মান ভাঙতেও অনেক সময় লেগেছিল।

মল্লিকা ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, 'জানি জানি, আপনাদের মত বড়লোকের ছেলেরা ওমনি—আমাদের মত গরীব মেয়েদের নিয়ে খেলা করে।'

—'হায় ভগবান! আমি বড়লোক এমন ধারণা তোমার কি করে হল?' শৌর্য বলেছিলেন।

—'বড় চাকরি তো করেন।'

মল্লিকাদের প্রায় বস্তিমত বাড়িতে গিয়ে বুঝেছিলেন, সত্যি ওরা কত গরীব। দু'মাসের মধ্যেই বিয়ে করে ফেললেন। চাঁদুর বিয়ের পর আবার তাঁর পুরন্ত সংসার হল। মল্লিকা, বিলু, রামের মা। প্রথম প্রথম মল্লিকা যেন খুশীতে উপচে পড়ত। বিলুকেও আদর করত খুব। কি মজাটাই যে হত তখন, কখনো কখনো মল্লিকা কপট ক্রোধে বলত, 'যাও যাও, আমি চলে গেলেও তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তোমার বিলুকে নিয়ে তুমি বেশ থাকতে পারবে।' তিনি মল্লিকার নাক টেনে দিতেন।

ক্রমে এ বাড়িতে মল্লিকা পুরোনো হতে লাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করলেন শৌর্য। মনে পড়ে, বিলু একটু একটু বাইরে যেতে লাগল। তবে বেশী দূরে নয়। মনে পড়ল ওর প্রথম অভিযানের কথা। সেদিন ছিল রবিবার। খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মল্লিকা রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ সারছে। রামের মা গেছে পান কিনতে। মল্লিকা এসে গলা জড়িয়ে ধরল। আর তখুনি কানে এল একটা বেড়ালের ভয়াবহ আর করুণ চীৎকার। রামের মা চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকল, 'অ দাদাবাবু, তোমার বিলু ছাদে উঠে কান্নিশে ঝাঁপ্যে পড়েচে—এই পড়ে মল্ল বলে! নিচে ছোঁড়াগুলো এমন চেঁচাচ্ছে আর হাততালি দিতে নেগেছে—'

মল্লিকার হাত সরিয়ে দৌড়ে বারান্দায় গিয়েদেখলেন, কতগুলো রাস্তার ছেলে হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে—'পড় পড়, মর মর।' মল্লিকা কী যেন বলল, শুনলেন না—সিঁড়ি টপকে টপকে দোতলা থেকে উঠে এলেন পাঁচতলার ছাদে। ততক্ষণ এ-ফ্ল্যাট ও-ফ্ল্যাট থেকে আয়া চাকর ইত্যাদি কেউ বা ইস উস করছে, কেউ বা মজা

পাচ্ছে। বৈশাখ মাসে তেতে যাওয়া ঢালু কার্নিশে বিলু বার বার রেলিং-এর দিকে আসবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বারবারই কার্নিশের ধারের দিকে চলে যাচ্ছে। তাঁকে দেখে বিলুর সেই আর্ত চীৎকার আর চাউনি। মিঁউ মিঁউ শব্দটা তখন কেমন হাউ হাউ শোনাচ্ছিল। বৈশাখ মাসে তপ্ত কার্নিশে বিলুর চার পায়ের তুলতুলে অংশটার কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল তাঁর। কার্নিশ রেলিং থেকে অনেকটা নীচে। শৌর্যেন্দ্র লম্বা মানুষ, হাত-পাও লম্বা লম্বা। চকিতে দেহের অর্ধেকের প্রায় বেশী ঝুলিয়ে দিলেন রেলিং-এর ওপর দিয়ে। কে যেন চীৎকার করল, 'করছেন কি? পড়ে যাবেন!' তার কথা হয়তো শেষও হয়নি, হাত বাড়িয়ে বিলুর ঘেঁটি ধরে তুলে এনে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। বিলু বাঁচার আনন্দেই হোক, ভয় থেকে মুক্তি পাবার আবেগেই হোক—সামনের থাবার নখ বসিয়ে দিল তাঁর গলায়। পেছনের দঙ্গলটা খুব তারিফ করছে।

উনি তরতর করে নেমে এসেছিলেন নিজের ফ্ল্যাটে। পিছনে রামের মা। ছবির মত মনে পড়ে। রামের মা ওকে একটু দুধ দিল। দুধ খেয়ে সোফার নীচে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল বিলু। তিনিও নিজের ঘরে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়লেন। কি পরিশ্রান্ত লাগছিল। গলার চামড়া ছিঁড়ে তখনও টপটপ করে রক্ত পড়ছে। মল্লিকা আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে বলেছিল, 'বাব্বাঃ, একটা বেড়ালের জন্য এত—একে কী বলে জান? আদিখ্যেতা!' ফিরেই তাঁর গলায় রক্ত দেখে ডেটল তুলো নিয়ে এসেছিল।—'হুঃ, কুকুর-বেড়ালকে নাই দিতে নেই—' সেই প্রথম মল্লিকার হাত ঠেলে দিয়ে নিজেই নিজের পরিচর্যা করলেন।

তারপর থেকে নানা ঘটনায় তাঁর মনে হতে লাগল, মল্লিকা বিলুকে ঈর্ষা করে। হাসি পেল। তাঁর বিলুটাও কিন্তু কম ছিল না। তিনি আর মল্লিকা পাশাপাশি বসে থাকলে হয়, বিলু তাঁর কোলে এসে বসবে, নয়তো দুজনের মাঝখানে শোবার চেষ্টা করবে। বেড়ালের ভেতরেও যে এত ঈর্ষা থাকে আগে জানা ছিল না তাঁর। সেই জন্যই কি মেয়েদের বেড়ালের সঙ্গে তুলনা করে? আর একটু মদ্যপান করা যাক। ক্রমে বিলুর যৌবন এল, বোঝা গেল বিলু হুলো। ফ্ল্যাট থেকে চলে যায় তো দুদিন পাত্তাই নেই। প্রথম দিকে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। একদিন মল্লিকা মুখ টিপে হেসে বললে, রামের মা বলছিল, তোমার বিলু এখন জোয়ান হয়েছে—ও ওর বৌ-এর কাছে যায়। শুনে লজ্জা পেয়ে ভেবেছিলেন, এটা তো তাঁর নিজেরই মনে হওয়া উচিত ছিল। ঢং ঢংকরে বারোটা বাজল। শৌর্যেন্দ্র মদ খেতে লাগলেন। মদ খেলে মাথাটা তো বেশ পরিষ্কার লাগে।

দু'বছরের মধ্যে মল্লিকা কেমন বদলে গেল। পাশের ফ্ল্যাটের মিঃ সিং-এর ফ্যামিলির সঙ্গে বড্ড ভাব হয়ে গেল মল্লিকার। ওদের বাড়ি ছাড়া তখন কথা ছিল না ওর মুখে। রায়তা দহিবড়া আরও কত রকম রান্না শিখত মিসেস সিংএর কাছে। একদিন এসে বলল, 'জানো, কাল মিসেস সিং-এর ভাই—ঐ যে গো মিঃ চোপরা, বলিনি তোমাকে—অর্জুন চোপরা, আজ দুপুরে সবাইকে নিয়ে সিনেমা গেল, আমাকেও যেতে বলেছিল, কিন্তু তোমাকে তো জিজ্ঞাসা করা হয়নি তাই যেতে পারলাম না।'

শৌর্যেন্দ্র বলেছিলেন 'কি দরকার ঐসব বাজে সিনেমায় গিয়ে? কি হয় ওসব দেখে?'

—'একটা থ্রিল তো হয়!' কর্কশ গলায় বলেছিল মল্লিকা। চমকে উঠেছিলেন। মনে পড়ে—সব মনে পড়ে। আর একদিন আপিস থেকে এসে দেখেন মল্লিকা নেই। কি, নাকি সিংদের ওখানে গেছে। রামের মা ডেকে আনল। অসন্তুষ্ট গলায় কি যেন বলতেই মল্লিকা জ্বলে উঠে বলেছিল, 'বাব্বাঃ বাব্বাঃ, এই গরমে একটু ফ্রিজের জল খেতে গেছি এতেও অপরাধ!'

আপিস থেকে 'লোন' নিয়ে ফ্রিজ কিনে এনেছিলেন শৌর্য। লক্ষ্য করলেন, ইংরেজী হিন্দী বাংলা মিশিয়ে ওদের সঙ্গে বেশ কথা চালিয়ে যায় মল্লিকা। অবাক হবার মত। একদিন ওদের বাড়ির জন্য দহিবড়া তৈরি করে রেখেছিল—বিলু তাতে মুখ দেওয়াতে কি নিষ্ঠুরের মতই মারছিল মল্লিকা বিলুকে, তিনি এসে না পড়লে—। বড্ড বেশী মেরেছিল। কেমন অস্বস্তিতে দিনগুলো কাটছিল তখন। সেই সময় হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে শোনেন, দরজার ওপর কে যেন কড়াটাকে ঠকাস ঠকাস করে মারছে! এত রাতে কে এল? দুজনেই ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন। এত রাতে কে হতে পারে? শৌর্যেন্দ্র উঠে দাঁড়াতেই মল্লিকা বলল, 'সাবধান, দরজাটা আগে অল্প ফাঁক করে দেখবে—দাঁড়াও, টর্চ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

—'কে?'

সাড়া নেই। একটু পরে আবার 'ঠক্‌ঠক্‌'। দরজা একটু ফাঁক করে টর্চ ফেলা হল। কেউ নেই তো? আর তখনই শোনা গেল, পায়ের নীচে মিঁউ মিঁউ শব্দ। বিলু শৌর্যেন্দ্রর পায়ের কাছে উল্টোপাল্টা খেয়ে মিঁউ মিঁউ করে আনন্দ প্রকাশ করছে।

দরজা বন্ধ করে শৌর্যেন্দ্র বললেন, 'ও নিজে কড়া দিয়ে ঠুকলো দরজা!'

মল্লিকা বললে, 'নিশ্চয়ই অন্য কেউ কুমতলবে ঠুকেছিল। বেড়াল দেখে পালিয়েছে। ও কি করে ঠুকবে? বেড়াল তো! তাছাড়া অত উঁচুতে কড়া—তোমার মত—।'

—'আহা, লোকগুলো তো ইঁদুর নয় যে বেড়াল দেখে পালাবে!'

মল্লিকার সঙ্গে সম্পর্কটা কদিন ধরে টানটান চলছিল। কিন্তু সেদিন রাতে এ নিয়ে সহজভাবে দুজনে অনেক কথা বললেন।

পরদিন দুপুরে আবার ঠকঠক। রামের মা দরজা খুলে দেখে বিলু। রামের মা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বিলু বেশ জোরে মিঁউ মিঁউ শুরু করল—যেন বলছে এটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, এত অবাক হবার কি আছে! আমাকে যেতে দাও। সেদিন বোঝা গেল, ও নিজেই ঠকঠক করে। কিন্তু করে কেমন করে? এতদিন বেরুবার জন্যে মিঁউ মিঁউ করত। দরজা খোলা হত। কারণ বেরুবার অন্য কোন যুৎসই রাস্তা ছিল না। মাঝে মাঝে বারান্দা দিয়ে ছাড়া আর ঢুকতে হলে বাইরে মিঁউ করে দরজার নীচে থাবা দিয়ে সামান্য আঘাত করত বা চুপ করে বসে থাকত। কেউ ঢোকবার সময় ঢুকত। এই কড়া নেড়ে দরজা খোলা নিয়ে বিলুর স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেল—যখন ইচ্ছে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

শৌর্যেন্দ্র তক্কে তক্কে রইলেন, দেখবেন কেমন করে ও ঢোকে। দেখলেন বিলু দু-পা মেঝেয় রেখে প্রাণপণ শক্তিতে দেহটাকে টানটান করে উঁচু হয়ে সামনের বাঁ থাবা দিয়ে দরজা চেপে ডান থাবা দিয়ে কড়াটাকে দরজার সঙ্গে ঠুকছে অনায়াসে। কাউকে দেখেছে ঠুকতে, দেখেছে তারপরেই দরজা খুলে যায়—কিন্তু এত বুদ্ধি বেড়ালের? কুকুরের অনেক বুদ্ধি থাকে, কিন্তু—। শৌর্যেন্দ্র খুব গর্ব হয়েছিল বিলুর জন্যে। এক-একদিন রাতে দুবার বেরুনো আর ঢোকা। না খুললে মানুষেরই মত অধৈর্য হয়ে আরো জোরে ঠকঠক। অন্য ফ্ল্যাটের বা মল্লিকার অসুবিধে হবে বলে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলেছেন তিনি। মল্লিকা অসম্ভব রেগে যায়। রাগ হবারই কথা। তাঁর নিজেরও তো রাগ হয়।

কিন্তু বেড়ালটাকে বোঝান কি করে? তবু নিজের মনেই বলে যান, 'দেখ বিলু, এরকম কোর না। বোঝ না কত অসুবিধে হয়, মল্লিকার ঘুম ভেঙে যায়!'

মল্লিকা চীৎকার করে ওঠে, 'এত রাতে কি হচ্ছে কি? বেড়াল নিয়ে সোহাগ? ওকে আমি খুন করে ফেলব, না-হয় রামের মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব বস্তা বেঁধে অন্য পাড়ায় যাতে ফিরতে না পারে।'

শৌর্য চমকে উঠেছিলেন। বিলু কি বুঝত কে জানে? ক'দিন নটায় বেরিয়ে ভোরে রামের মা আসবার সময় ফিরত। কিন্তু আবার সেই। মল্লিকা বস্তা বেঁধে পাঠিয়েও দিয়েছিল কোথায়। উনি রাগ করেছিলেন, কোন কাজে মন বসাতে পারেননি। সাতদিন পর আবার সেই ঠক-ঠক গভীর রাতে। শীর্ণ বিলু ফিরে এসেছে। তারপরেই প্রচণ্ড অসুখ করল বিলুর। মিঁউ করার শক্তিও রইল না। করুণ চোখে কেবল শৌর্যের দিকে তাকায়। ভেটেরেনারির কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার বলেছিল পরে আনলে আর বাঁচানোই যেত না। মল্লিকা রেগে বলেছিল, বেড়ালের জন্য এত টাকা খরচ? এমনভাবে তিনি ভাবছেন—যেন বিলু একটা মানুষই ছিল। নয়ই বা কেন? মল্লিকা চলে যাবার পর ক'দিন আপিস যাননি তিনি—বিলুও তো বার হয়নি, খাবার জন্যে বায়না করেনি। কেবল তাঁর কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকত, নাহলে সামনের থাবা দিয়ে ওঁকে ছুঁয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কি বুঝেছিল ও? আমার কষ্ট বুঝেছিল? আর তো কেউ বোঝেনি। বিড়বিড় করে উঠলেন, নাঃ, নেশা যেন বড় বাড়ছে। মনে পড়ে, রামের মা তাঁদের দুজনকেই সাধ্যিসাধনা করে খাওয়াত সেই সময়। একদিন আপিস থেকে ফিরে চিঠি পেয়েছিলেন—মল্লিকা অর্জুন চোপরার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। ডিভোর্স চেয়েছিল, অসুবিধে হয়নি কোন। তার কিছুদিন বাদে মিঃ সিংবাও এ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এক অভিজাত পাড়ায়।…বিলু! অস্ফুটে ডাকলেন শৌর্য। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সেই সময় চাঁদু এসে ক'দিন ছিল তাঁর কাছে। রাতে ঠকঠকানিতে সেও একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'মরেও না বেড়ালটা!' এমন চীৎকার করে ধমক দিয়েছিলেন শৌর্য তাকে, চাঁদু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চাঁদুকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ ওরা তো অবলা জীব—ওরা তো নির্ভর করে আমাদের ওপর—' বুঝেছিলেন বলাটা কেমন বই-এর মত হয়ে যাচ্ছে।

চাঁদুও কিছু বোঝেনি বোধহয়। ভেবেছিল কাকীর শোকে কাকার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঘুম পাচ্ছিল চাঁদুর। হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়েছিল।—নাঃ, নেশাটা বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে, চিন্তা এলোমেলো হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা আজ বুঝতে পারছেন, শেষের দিকে মল্লিকা যে অত রেগে যেত বিলুর ওপর, ঝগড়া করত—ভাব করত যেন বেড়ালটার জন্যেই ওর এখানে থাকা অসম্ভব হচ্ছে—কেন? যেন ঐ বেড়ালের জন্যেই তাকে ঘর ছাড়তে হল—ওটা এক্সকিউজ ছিল! তাই যদি

ওঃ, একটা শব্দ—একটা স্বর আমার দুর্জয় ক্ষমতাকে পরাস্ত করল! ইচ্ছা করলে হয়, তবে অর্জুন চোপরা কেন? আসলে মল্লিকার কাছে উনি ছিলেন একটা স্টেপিং স্টোন। আধা ভদ্র থেকে ভদ্রমহিলা হল—এখন অভিজাত। অনেক পয়সা আর আভিজাত্য। যত পয়সা তত আভিজাত্য। আর শৌর্যেন্দ্র ঝামেলা এড়াতে প্রমোশনগুলোই নিলেন না। তা না হলে আজ তাঁরও তো—এ কি? অনুতাপ হচ্ছে নাকি তাঁর? পয়সা করতে পারেননি বলে? ছিঃ ছিঃ! নাঃ, মদ জিনিসটা খারাপ। তবু আর একটু খাওয়া যাক।

আপিসের বিনোদ ছেলেটা সেদিন কি বললে? নামটাই আপনার শৌর্যেন্দ্র—শৌর্য বীর্য আপনার কিছু নেই। নাহলে এই কোয়ালিফিকেশন নিয়ে কেরানীগিরি করেন? এইখানে পড়ে থাকেন? ম্যানেজার ধমকালে অমন চুপ করে থাকেন? বিনোদের কথাই সত্যি। এক ভালোবাসতে পারা ছাড়া আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে তাঁর? এখনও তিনি খবর রাখেন মল্লিকার। মল্লিকা বেপরোয়া হয়েছে, সুখী হতে পারেনি। বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছেন—মরুক গে।

ঐ মেয়েছেলের তো ওইরকমই হবে। থাক, থাক, কেন এত রাতে এত কথা মনে পড়ে?—রাত, নিশিজাগরণ তো স্মৃতি-রোমন্থন।—নাঃ, আর না।—আচ্ছা ডাক্তার বলেছিল বেড়াল নাকি ছয় সাত বছরের বেশী বাঁচে না? তবে বিলু দশ বছর বেঁচেছিল কি করে? তার মানে একটু যত্নআত্তি করলে খেতে-টেতে দিলে বেড়ালও বাঁচে বেশিদিন। যারা বেড়াল পোষে তাদের কাছে খবর নিতে হবে। হতেও পারে। এই মানুষেরই দেখ না। যাদের খাবার অভাব নেই তারা নিশ্চয়ই রাস্তার ভিখিরিদের চেয়ে বেশী বাঁচে। কালই একটা কাগজে পড়ছিলাম ম্যালনিউট্রিশনে—আফ্রিকা, ভারত। আরে ধুত্তোর, কিসে থেকে কি! বিলু মরছিল না বলে কি গাড়িচাপা দিয়ে মারলে ওকে ভগবান, নাকি বিলু ইচ্ছামৃত্যু বরণ করল? পরশু না তরশু—ঘর নোংরা করেছিল বলে বেশ কয়েক ঘা দিয়েছিলেন তিনি। ভুলে গিয়েছিলেন—ওরও তো বয়স হয়েছে, ও তো বৃদ্ধ! ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন শৌর্যেন্দ্র। নাঃ, নেশাটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে, বমি পাচ্ছে। মল্লিকা শেষের দিকে বিলুকে কেবল মারত—কেননা বিলু বমি করেছিল একদিন। সল্ট লেকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসবেন নাকি যে বিলু মরেছে,—বাথরুমে গিয়ে বমি করলেন। মুখ, গা, হাত, পা ধুলেন। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে—ঘু—ম শান্তি।

ঠক-ঠক-ঠক দরজায় আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙল। নেশা বেশি হয়ে গেছে তাই ঠকঠক আওয়াজ শুনছেন, আধো ঘুমে হাসি পেল তাঁর। পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরছিলেন—ঠক-ঠক-ঠক-ঠক চারবার—ঠিক বিলু যেমন করত। কিরে বাবা, বেড়ালেরাও ভুত হয় নাকি ? ঘড়ি দেখলেন সাড়ে চারটে। বিলু এক-একদিন এমন সময় ফিরত। আসলে অভ্যাস, কল্পনা করছেন তিনি। ঠক-ঠক-ঠক-ঠক—আরও জোরে। ব্যাপারটা কি ? উঠে পড়লেন, দরজা খুললেন —বিলু সুড়ুৎ করে ঢুকে মি*উ মি*উ করতে লাগল। হাঁ করে চেয়ে রইলেন বিলুর দিকে—বিলু মরেনি !! তাহলে কাল রাত্তিরে কাণ্ডটা কি হল ? নাঃ, ঐ তো জুতোভর্তি আদিগঙ্গার কাদা। তবে কি নেশার ঝোঁকে ওখানে গিয়েছিলেন ? ঐসব ছেলেগুলো—গর্ত খোঁড়া ? সব কি করে স্বপ্ন হবে ? বিলু তাঁর দিকে তাকিয়ে অসম্ভব জোরে মি*উ মি*উ করছে। ফ্রীজ খুললেন—সন্দেশের বাক্সটা ? কোথায় বা পড়ে গিয়েছিল কাল রাতে—কিন্তু ব্যাপারটা কি হল ? সাদা চুলের মধ্যে বার বার আঙুল চালাতে লাগলেন।

রামের মা এল, 'হ্যাঁগো বাবু, তুমি কাল একটা বিড়ালেরে গঙ্গার ধারে ফেলে দিয়ে এসেছ ? ওটা ঐ সামনের বস্তির গোরী জমাদারণীর বেড়াল—,' ওঃ তাহলে বিলুরই কোনও বংশধর হবে হয়তো। ওর মতই তো দেখতে ছিল। চা করো রামের মা, আর দেখ তো বিলুকে—কিছু খেতেটেতে দাও। বলে পাশ-বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লেন শোর্যেন্দ্র। বিলু লাফ দিয়ে উঠে তাঁর গা ঘে*ষে শুল।—মি*উ মি*উ…।

দুঃস্বপ্ন
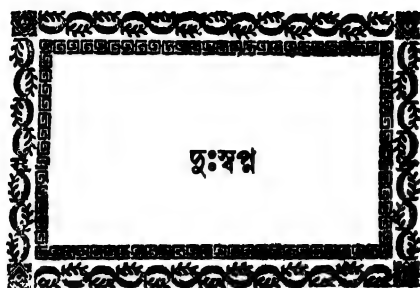
প্রায়-বৃদ্ধ শোকজয়ী বসে আছেন একটা চেয়ারে। কারুকার্যখচিত অত্যন্ত মূল্যবান চেয়ার। এ কক্ষ কোথায়? তা বলতে পারব না। কোন্ সময়? তাও বলা শক্ত—হয়তো অনেকদিন পরের, কিংবা অনেকদিন আগের এক ঘটনা—বা স্বপ্ন। কক্ষটি কখনও সাধারণ ছোট, কখনও বিশাল। সামনে একটা টেবিল। তাতে কতই যে জিনিসপত্র—তার কোনটার যে কী দরকার জানি না।

শোকজয়ী,—নিজেরই দেওয়া নাম। আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই নামেই তিনি পরিচিত। তিনি চিন্তায় মগ্ন। চিন্তা তাঁর পুত্র কৃতান্তজিৎকে নিয়ে। উচ্চাশা পেয়ে বসেছে তাকে। বড় বেশী উচ্চাশা। তাই নিজেকে অনেক বাঁচিয়ে চলতে হয় তাঁকে। উচ্চাশা চাই—চাই-ই, নাহলে মানুষ মানুষই নয়। কিন্তু কোন্ উচ্চাশা? আজ এই যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন তিনি, পৃথিবী প্রায় জয় করে ফেলেছেন, সাগরও তাই, কিন্তু তারপর দূরের গ্রহনক্ষত্র চাই—কেন? এ কি শুধু ছেলেখেলা! কৃতান্ত এখনি ক্ষমতা চায়। তা কি দেওয়া যায়? যেভাবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের দেশের মানুষদের চালাতে হবে—ঠিক করে চালাতে হবে, তবে তো এই ব্রহ্মাণ্ড টিঁকবে, তার উন্নতি হবে, মানুষের উন্নতি হবে। আরও উন্নতি চাই—আরও!

বোঝে না, কৃতান্ত বোঝে না। সন্ধ্যে হতে চলল—আজ এখনও একটাও অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর আসেনি। কৃতান্ত কি ক্লান্ত হয়েছে? ভাল! পোষ মানাতে হবে। এদের সবাইকে পোষ মানাতে হবে। সসাগরা পৃথিবী। এখনও কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী আছে তবে থাকবে না। ঝিন-ঝিন করে কী বাজল? প্রহরী দুজন আছে নীচে, তাদের পায়ের ধাক্কা লেগেছে যন্ত্রে? নাকি কৃতান্ত আবার

কোন উৎপাত করতে আসছে ? এত দিয়েছি ওকে—কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্বে তো আর সব ক্ষমতা—! নাম রাখলাম কৃতান্তজিৎ—হয়ে গেল কৃতান্ত, এই হয় !

আবার কেন নূপুরধ্বনি ? নিশ্চয়ই সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে আসছে—কোন প্রহরী। তাহলে যন্ত্রের শব্দ তো এইরূপ ধারণ করে না ! কে ? পৃথিবীকে, এই সাম্রাজ্যকে সুন্দর—অতি সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। তাই শাশ্বতী-সুন্দরীকে নির্বাসিত করেছিলাম। বড় বৃত্তান্ত জানতে চাইত, 'এটা কেন ? ওটা কি উচিত হচ্ছে ? বেশ তো ছিল ওই জেলেদের দ্বীপটা, বা ওই পাহাড় রাজ্যটা, এত করের বোঝা কেন চাপালে ?' বোঝে না বোঝে না ! ব্রহ্মাণ্ডকে সুন্দর করতে হলে কত জীবকে উৎসর্গ করতে হয়। কেবল দয়া আর কোমলতায় কাজ হয় না। তাই তো তাকে নির্বাসিত করতে হোল ওই দূর দ্বীপে। তারপর নাকি এক প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগে ওই দ্বীপে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সেও গিয়ে থাকবে—তাতে আর কী এসে যায় ? তাঁর নিজের ব্রত, আদর্শের সুন্দর রূপ দিতে হবে।

দরজার কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়াল এক যুবক। সুন্দর। কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েই পড়ে গেল। কৃতান্ত পড়ে গেল কেন ? সে তো জানে, এই স্ফটিকের দরজায় একটা লুক্কায়িত বোতাম টিপলেই দরজা খুলবে। নিজের অজান্তেই যেন শোকজয়ী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। মুহ্যমান পরিশ্রান্ত যুবকটিকে ভেতরে নিয়ে এলেন।

প্রহরীরা দৌড়ে এসেছে। একজন বললে, 'মহামান্য, এই অদ্ভুত যুবক আমাদের ধোঁকা দিয়ে এখানে এসেছে। এমন পোশাক পরেছে—দাড়িগোঁফ—আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম মান্যবর কৃতান্তজিৎ, তারপর যখন ভ্রম বুঝতে পারলাম, তখন ক্ষিপ্রগতি এই যুবক অনেকটাই—'

শোকজয়ী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'থাক, তোমাদের ভরসায় এই দেশ এই রাজ্য আমি চালাই না—চলে যাও তোমরা।' স্ফটিকের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শোকজয়ী বললেন, 'যুবক মুখ তোল। নাঃ, তুমি কৃতান্ত নও। যদিও যে কেউ তোমাকে কৃতান্ত বলেই ভুল করবে।…তুমি উত্তেজিত, হাঁপাচ্ছ,—একটু পানীয় দেব ?'

নিজেই হঠাৎ কোথা থেকে মুহূর্তে একপাত্র সুমিষ্ট পানীয় যুবকের হাতে দিলেন। যুবক সেই পানীয় পান করে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শোকজয়ী বললেন, 'তুমি কে ? আমার কাছে এসেছ কেন ?'

যুবক তার কালো চোখ দুটি তুলে বলল, 'আমি বাঁচতে এসেছি। শুনেছি আপনি মহানুভব, এখানে আর কারো সাহস নেই যে কৃতান্তজিতের হাত থেকে আমাকে বাঁচায়, আপনি—কেবল আপনি পারেন আমাকে বাঁচাতে। দয়া করুন—'

—'কৃতান্ত তোমাকে মারতে চায় একথা তোমাকে কে বললে ? কেন সে তা চাইবে ?' শোকজয়ী বলেন।

—'মহানুভব, আপনার কাছে হয়তো অনেক খবর এসে পেঁছয় না। কত যুবকের দেহ হাঙ্গরের খাদ্য হচ্ছে। কত কংকাল বিদেশে চালান হচ্ছে। আরও কত অদ্ভুত—'

—'তুমি প্রাণভয়ে আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছ, না সমাচার দিতে এসেছ ?'

শোকজয়ীর কথায় যুবক একটু থেমে বলে, 'এসব সমাচার আপনার জ্ঞাত থাকাই স্বাভাবিক, তবু আমার অবস্থাটা বোঝাবার জন্য—আমার মত কত শত সহস্র যুবক আপনার ঐ কৃতান্তর হাতে—'

বাধা দিয়ে শোকজয়ী বলেন, 'কৃতান্ত আমার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী !'

—'কিন্তু আপনি তো পৃথিবীকে সুন্দর করতে চান ?'

—'কৃতান্তও চায়।'

—'চায় ? আপনার কথা শুনে আমি বিস্মিত।'

—'তুমিও তো চাও—চাও না ?'

—'আমরা সবাই চাই। কিন্তু কৃতান্ত যা বলে আপনি কি মানেন ?'

—'কী বলে ?' শোকজয়ীর ভুরু কুঞ্চিত হয়।

—'অনেক দুর্বল মানুষকে বা অনেক অন্যভাবের মানুষকে ধ্বংস করলেই এই পৃথিবী ভাল হবে, সুন্দর হবে—'

—'শুধু পৃথিবী নয় যুবক, সসাগরা ধরণী এবং আকাশ—'

—'মহানুভব, কতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা শোভন আর কতটা নয়, সে সম্পর্কে ভাববার দরকার নেই ?'

শোকজয়ী পরম বিস্ময়ে তাঁর পিঙ্গল চোখ তুলে তাকালেন যুবকের দিকে, 'তোমার পরিচয় এখনও আমি পাইনি—তুমি কে ?'

—'আমি আপনার একজন প্রজা। সামান্য লোক। বাড়ি আমার দক্ষিণ দ্বীপে।'

শোকজয়ী ভাবলেন, দশ বছর আগের প্লাবনে সে-সব দ্বীপ তো ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। তবে আবার বুঝি লোক জড়ো হয়েছে—বসতি করেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—এ সংবাদ তো তিনি পেয়েছিলেন। হঠাৎ ঘুরে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম কী? কে তোমার পিতা?'

—'আমার নাম শাশ্বত, আর পিতার নাম শুনেছি ধরণীশ্বর। তবে পিতাকে আমি দেখিনি, জননীর মুখে শুনেছি তিনি পৃথিবীকে ভাল করবার জন্য সুন্দর করবার জন্য কোন এক দূর দেশে অথবা কোন গ্রহে ধ্যানমগ্ন।'

শোকজয়ী হঠাৎ মনে মনে শঙ্কিত হলেন। তাহলে তাঁর আরও এক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে! বললেন, 'তুমি জান না তিনি কোথায়?'

—'সত্যই জানি না। আমার অস্তিত্বও তিনি জানেন না।'

শোকজয়ীর ভুরু কপালের মাঝখানে উঠে গেল। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন শাশ্বতর দিকে। যুবক সত্যিই সরল, না কি? আঃ, অনেকদিন থেকেই আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। হঠাৎ প্রশ্ন করেন, 'তোমার মায়ের নাম?'

শাশ্বত বলে, 'মা নিজের নাম বলতে চান না, কখনও রহস্য করে বলেন লাঞ্জিতা, কখনও বঞ্চিতা, কখনও—যাক, আমার মা কিন্তু তীক্ষ্ণধী। কিন্তু থাক আমার মায়ের কথা। মহানুভব, আমাকে কথা দিন কৃতান্তর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবেন! কথা দিন মহানুভব!'

শোকজয়ী যেন নির্লিপ্ততার প্রতিমূর্তি।—'কিন্তু তুমি আমাকে এখনও বলনি, সে তোমাকে মারতে চাইবে কেন? কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? কী তুমি তাকে বলেছ? তার মতামতের কোন প্রতিকূল কথা তাকে কি তুমি বলেছিলে?'

—'না, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সংবাদ পেয়েছি, আমি এখানে এসেছি শুনেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন!'

—'কে তোমাকে এই সংবাদ দিল?' বিরক্তি দমন করে প্রশ্ন করেন শোকজয়ী।

শাশ্বত নরমকণ্ঠে উত্তর দেয়, 'এক সুহৃদ।'

—'সুহৃদ?' তাহলে কৃতান্তর ভিন্নপথের লোকেরও এত সাহস আছে যে এই যুবকটিকে সাবধান করতে পারে?—ভাবেন শোকজয়ী। যুগপৎ আনন্দিত এবং বিরক্ত হলেন তিনি। প্রশ্ন করেন, 'কতদিনের সুহৃদ তিনি তোমার?'

—'মাত্র একদিনের। কাল অনেক রাতে যখন রাজধানী, এই 'আকাশভেদী'

বিশাল বিশাল হর্ম্যে শোভিত উচ্চতায় পরিপূর্ণ নগরীতে পৌঁছলাম তখন ক্ষুধায় ক্লান্তিতে আমি বুদ্ধিহারা—'

—'তোমার কাছে কোন খাদ্য ছিল না? কোন বিপণি, পান্থশালা উন্মুক্ত ছিল না?'

—'ছিল, পান্থশালায় করপ্রথা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু পান্থশালা, বিপণি উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমার কোন লাভ হয়নি। আমার কোন অর্থ ছিল না। কারণ আমি তঞ্চক দ্বারা প্রবঞ্চিত এবং তস্কর দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়েছিলাম।'

—'তঞ্চক, তস্কর এখনও এই আকাশভেদীতে?'

—'শুনলাম দক্ষিণদেশ থেকে যারা আসে তাদের লুণ্ঠন করলে তা শাস্তি-যোগ্য নয়!'

—'মিথ্যা কথা।' গর্জন করে উঠলেন শোকজয়ী, 'যুবক, মিথ্যা কথা বলার পরিণাম—'

—'মহানুভব, তাই তো বলছিলাম অনেক সংবাদ আপনার কাছে আসে না।'

—'তারপর?'

—'পথের পাশে তজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। এক বৃদ্ধা জল দিয়ে খাদ্য দিয়ে যখন আমার পরিচর্যা করছিলেন, তখন অন্ধকারে একটি পুরুষ-কণ্ঠ বললে, "মা, ওকে কেন বাঁচিয়ে তুলছ? ওর মৃত্যু এত কাছে—ও কৃতান্তর কোপে পড়েছে, ওকে তুমি"—তারপর অতি মমতায় আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বন্ধু, যদি বাঁচতে চাও তবে একমাত্র উপায় মহান মহানুভব, শক্তিধর শোকজয়ীর কাছে যাওয়া—অবশ্য যদি যেতে পার! তবে তিনিই তোমাকে রক্ষা করতে পারেন।" আমি বললাম, আমার অপরাধ কি? সে বললে, "তুমি দক্ষিণদেশ থেকে এসেছ এবং প্রকাশ্যেই বলেছ, এইভাবে পৃথিবীকে সুন্দর করা যায় না!'

শোকজয়ী বাধা দিয়ে বললেন, 'যুবক, সত্যই কি তুমি তাই মনে করো?'

শাশ্বত বিব্রতভাবে বলে, 'মহানুভব, আপনি নিজে কি ভাবেন জানি না, কিন্তু কৃতান্ত বলে, সুন্দর বাগিচা করতে হলে আগাছা তুলে ফেলে দিতে হয়, তেমনি দুর্বল বোকা মানুষদেরও—'

—'থাম! বাগিচা সুন্দর করতে হলে আগাছা উৎপাটন দরকার!'

—'দেব, উপমা অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু বাগিচার উপমা কি মানুষের বেলায় প্রযোজ্য? তাহলে আপনার কল্পনার সুন্দর পৃথিবী যে রাক্ষসে পরিপূর্ণ হবে!'

শোকজয়ী ভ্রূকুঞ্চিত অবস্থায় হেসে ওঠেন,—'কেমন করে?'

—'তাহলে অনুমতি দিন আর একটা উপমার কথা বলি—বৃহৎ মৎস্যগুলি ক্ষুদ্র মৎস্য খায়, তাহলে যার দৈহিক ক্ষমতা বেশী সেই তো বাঁচবে, থাকবে! আপনি কি বিশ্বাস করেন, কেবল দৈহিক শক্তিসম্পন্ন মানুষই সসাগরা পৃথিবী তথা অন্তরীক্ষ সুন্দর করতে পারবে?'

—'তুমি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করেছ? দক্ষিণ দ্বীপে তো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই! তুমি কি কোনো ভিন্ন রাজ্যে —'

—'না, কোন ভিন্ন রাজ্যে আমি যাইনি। আমার যা শিক্ষা আমার মাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

—'হেঁয়ালি পরিত্যাগ কর। কে তোমার মাতা?'

—'ধরিত্রী। তাই ধরিত্রী সুন্দর হোক এ আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার মা বড় সুন্দর, তাকে সুন্দর থাকতে দিন, আপনার কৃতান্তকে সংযত করুন। আপনি অনেক সময়ই ধরিত্রীকে সহ্য করতে পারেন না, তাই আপনি সসাগরা পৃথিবী এবং আন্তরীক্ষ জয় করবার কল্পনা করেন। ভুলতে চান কিন্তু ভুলতে পারেন না, ধরিত্রী আপনার শিকড়, আপনার প্রেরণা। আপনি ঋণী তার কাছে। কৃতান্ত তাও ভুলেছে। আপনি তাকে ভুলিয়েছেন। সে মায়ের পরিচয় জানে না। তাকে জানতে দিন—'

শোকজয়ীর কণ্ঠ ইস্পাতের মত ধারালো ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে, 'কে তুমি যুবক? আমি তোমার সত্য পরিচয় জানতে চাই। তুমি আমাকে প্রবঞ্চিত করেছ। তোমার কথায় যেন আমি অন্য কারো কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। বল—বল তুমি কে? নাহলে তোমার—'

—'মহানুভব, আমি আপনার কাছে জীবনভিক্ষার জন্য এসেছি। আপনি আমাকে বাঁচতে দিন পিতা—'

—'পিতা?'

—'হ্যাঁ, পিতা। আমার যা কিছু জ্ঞান অভিজ্ঞতা সবই আমার মাতা শাশ্বতী-সুন্দরীর কাছ থেকে পেয়েছি। ধরিত্রীর বড় কাছের সে। আপনাকে প্রবঞ্চনা করতে আসিনি, আপনাকে দেখতে এসেছি পিতা—'

শোকজয়ী স্তব্ধ। চোখ ঘূর্ণায়মান। ভাবছেন—শাশ্বতীসুন্দরীর অন্য নাম কি ধরিত্রী ছিল? মনে পড়ছে না।—'তুমি আমার পুত্র? প্রমাণ?'

—'মাতাকে যখন নির্বাসিত করেন তখনই আপনার পুত্রের অধিকার আমি লাভ করেছি পিতা। পুত্রকে হত্যা করে আপনার পৃথিবী সুন্দর হবে পিতা?'

—'তুমি স্ত্রীলোকের মত করুণা ভিক্ষা করছ! ছিঃ, তুমি আমার পুত্র হতে পার না। আমার পুত্রের পরিচয় তার পৌরুষে। তুমি নারীর অধম। তোমার মত দুর্বল পুরুষ পৃথিবীর ভাল করতে পারে না—'

—'নারীর অধম বলে কোন পুরুষকে ছোট করেন কেন? নারী যথেষ্ট নিষ্ঠুর নয় বলে?'

—'তোমার ঔদ্ধত্য অসহ্য হয়ে উঠেছে।'

—'কিন্তু নারীও যথেষ্ট নিষ্ঠুর হয় পিতা, নাহলে কোন্ বহুদূর যুগে যখন বলবান ক্ষমতাসীন একদল মানুষ সিংহ দিয়ে সাধারণ মানুষকে খাওয়াত, তখন নারীপুরুষ একই সঙ্গে সেই দৃশ্য উপভোগ করত! তাই—'

—'হুঁ! অদ্ভুত তোমার কথা। নাঃ, অনেক জ্ঞান তোমার অধিগত। আমি বলছি বীর্য—বীর্য চাই। অকারণ করুণায় স্বভাব নষ্ট হয়। কাজ হয় না। পৃথিবীকে সুন্দর করতে হলে তোমার ঐ মাত্রাধিক ভাবাবেগ সংযত করতে হবে।'

—'পৃথিবীকে কী করে আপনি সুন্দর করবেন? অন্তরীক্ষে রাজ্যবিস্তার করছেন পৃথিবীর ধ্বংসের আশায় তো?'

—'যুবক, আমার পৃথিবীর নিয়মে আমি কোন বিশৃঙ্খলা সহ্য করব না, তাতে যদি—'

—'প্রকৃতির নিয়মে আপনাদের মত অনেক মানুষ বহু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন—অতএব আপনার বানানো শৃঙ্খলায় যদি বিশৃঙ্খলা ঘটে, তবে আশ্চর্য কী?'

এমন সময় সেই কক্ষের একপাশের কী এক যন্ত্রে—না-না, একটি মস্তবড় গোলাপফুল ফুটে উঠল, সুমিষ্ট গন্ধ সেই সঙ্গে সুমিষ্ট বংশীধ্বনি ভেসে এল। মুহূর্তে শোকজয়ীর বসবার আসন সেই ফুলের কাছে চলে গেল। যুবক সেই ফুলের মধ্যে যেন এক আবছা স্ত্রী-মূর্তি দেখতে পেল, যেন ছবি। তারপর আর কিছু দেখা গেল না। শোকজয়ী কার সঙ্গে কথা বলছেন? কথা বলছেন ঠিকই।

এইবার শাশ্বত ভাল করে কক্ষটি দেখতে লাগল। কত কত ছবি, ভাস্কর্য! পুঁথির যেন অন্ত নেই! সারা ছাদ জুড়ে যেন আকাশ চন্দ্র তারা ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। ফুলের গন্ধ, কতরকম ফুলের, ঠিক কোন্ ফুলের যেন ধরতে পারছে না শাশ্বত। কিন্তু ফুলের নিশ্চয়ই। হঠাৎ দৃশ্য পাল্টে গেল। দুই অর্ধনগ্নিকা আলাপে মগ্ন। কিন্তু তাদের অশ্লীল মনে হচ্ছে না। তার মানে পটপরিবর্তন

হচ্ছে মাঝে মাঝে? ও কি! বিরাট ড্রাগন—জিহ্বা লকলক করছে—ভীত হতে হয়। সত্যই জিহ্বা। একপাল শকুন বসে আছে। কুরুক্ষেত্র? না, প্রমিথিউসের পাকস্থলীর জন্য বসে আছে ওরা? আবার সুনির্মল আকাশ—ফুলের গন্ধ। এ কোন্ জায়গা? বিভ্রম ঘটে। জাদু? ওদিকে শোকজয়ী কথা বলে চলেছেন সেই সুঘ্রাণিত গোলাপের মাধ্যমে। ভোগবতী বলছে, 'শোকজয়ী, পৃথ্বীশ, এ তুমি কী করলে? পুত্রকে কী শিক্ষা দিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ সে আমার কক্ষে এসেছিল।...কেন? আমাকে ভোগ করতে চায় সে—না, না, অমন উত্তেজিত হবার কারণ নেই! তুমি, তোমার জন্য এটা ঘটতে পেরেছে—কারণ অনেক কথা, বড় দামী দামী কথা—ন্যায় ধর্ম তিতিক্ষা ধৈর্য এইসব কথা তুমি সাধারণের জন্য বলো। নারীর প্রতি সম্মানের কথাও তুমি সাধারণের মন রাখার জন্য বলো—কিন্তু নিজের মনের দিকে চেয়ে সত্য বলো তো, নারীকে ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছু কি মনে কর তুমি? আর কৃতান্ত সেটা ভাল করেই জানে, তাই তার এই সাহস! আমি যে ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নই। আমি কেন? তোমার এই বিরাট প্রাসাদে যত নারী তারা যে কাজেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, তারা সবাই তাই। অধীশ্বর, আজ আমি অপমানিতা। 'ভোগবতী'! তুমিই আমার এই নাম দিয়েছিলে। হায়! যে শিশুকে আমি দুবছর বয়স থেকে এত বড় করেছি সে আজ আমাকে—! এই সভ্যতা তোমারই সৃষ্টি!'

শোকজয়ী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'তার সহচরীর তো কোন অভাব ছিল না। তার বাসনাতৃপ্তির কোন অভাবই তো আমি রাখিনি, তবে—'

ভোগবতীর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন হয়ে উঠল, 'না, তা রাখনি! তবে তোমার বিকৃত চরিত্রের বিকৃতি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। ওঃ হো! শোকজয়ী! তুমি শোকজয়ী, স্নেহমমতাজয়ী, অনেক কিছু জয়ী তুমি! কিন্তু তুমি কামজয়ী নও, তুমি ঈর্ষাজয়ী নও, তুমি ক্রোধজয়ী নও! কৃতান্ত জানে আমি তার নিজের মা নই। আজ যদি সে তোমার স্ত্রী, তার নিজের মা, শাশ্বতী-সুন্দরীর কাছে মানুষ হত তবে সত্যি হয়ত সে 'মানুষ' হত। স্বেচ্ছাচারী হত না। সেই তীক্ষ্নবুদ্ধিশালিনী তোমাকে চেতনা দিতে চেষ্টা করত, তোমার ভুলত্রুটির কথা বলত, কিন্তু সে জানত না যে তোমার ত্রুটির কথা তুমি সহ্য করতে পার না—সে জানত না যে এই কারণে তাকে নির্বাসিত হতে হবে।'

শোকজয়ী চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমার এই ভৎসনা প্রলাপের উক্তি!

শোন! কিছু নিরুত্তেজক আরক গ্রহণ কর। এখনি শান্ত হবে। আমি ঐ কামুক অর্বাচীনটার ব্যবস্থা করছি।'

ভোগবতী সুন্দর করে হাসলেন, 'কী ব্যবস্থা করবে? তাকে নির্বাসিত করবে? না অপসারিত করবে? কিন্তু তোমার এই অতি অগ্রসর সভ্য ব্যবস্থায় কত কৃতান্ত জন্ম নিয়েছে জান কি? তার বিশাল অনুগামীদের কথা জান?'

—'জানি জানি, সব জানি। ভোগবতী, আমি আদেশ করছি তুমি নিদ্রা যাও। যখন নিদ্রা ভাঙবে, তখন দুঃস্বপ্নও কেটে যাবে—'

গোলাপফুল মিলিয়ে গেল। শোকজয়ী আসনসমেত নিমেষে শাশ্বতর কাছে। শাশ্বত তখন তন্ময় হয়ে দু যুগ আগের এক দুর্ভিক্ষের চিত্র দেখছে। কঙ্কালসার মানুষ-মানুষী আর এক শিশু ভিক্ষার মৃৎপাত্র সামনে রেখে বসে আছে। চোখ তাদের কোটরগত, কিন্তু কেমন শান্ত মৃত্যুর মুখোমুখি ওরা। আর এক শীর্ণকায় গাভী ডাকবার চেষ্টা করছে, সেও মৃত্যু দেখছে।

—'কী শাশ্বত, বিস্মিত হয়ে কি দেখছ?' শোকজয়ীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল শাশ্বত।

মৃদু হেসে শাশ্বত বলে, 'অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম, অপূর্ব সুন্দর এবং অদ্ভুত কুৎসিত সব—'

—'এই, এইটেই তোমাকে শিখতে হবে—সুন্দর এবং কুৎসিত পাশাপাশি চলে—'

—'এর মধ্যে অনেক কুৎসিত কি মানুষেরই বা আপনাদেরই বা আমাদেরই সৃষ্টি নয়?'

—'তাই তো! যা কিছু কুৎসিত সবই ধ্বংস করতে হবে। তুমি আমার পাশে থাকলে আমি—'

—'কিন্তু আমি—! আমার ভাগ্য নির্ধারণ তো এখনও হয়নি। শরণাগতকে আপনি তো এখনও আশ্রয় দেননি, অভয় দেননি!'

—'বেশ অভয় দিলাম।' একটু চুপ করে থেকে বললেন শোকজয়ী, 'কিন্তু কৃতান্ত যদি সত্যই তোমাকে হত্যা করতে চায় তাহলে আমার পক্ষেও তোমাকে রক্ষা করা কঠিন হবে।'

—'তাহলে আপনার এই অভয়দানের কী অর্থ?'

—'আমি তোমাকে অতি আধুনিক অস্ত্র দেব, তুমি পারবে না তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে?'

—'অর্থাৎ আপনি আমাকে অস্ত্র দিতে পারেন—অভয় দিতে পারেন না!' মৃদু হাস্য-উদ্ভাসিত শাশ্বতর মুখ।

—'অভয় অর্জন করতে হয়।'

শাশ্বত এবার আরও সুন্দর করে হাসল। দুই গভীর কালো চোখ তুলে শোকজয়ীর দিকে তাকাল। কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন উনি? কেন এই পরিবর্তন? কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথায় সে-সব মায়াময় দৃশ্য? সত্যই জাদু। উন্নত—পৃথিবী উন্নত হচ্ছে। শাশ্বত জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশক্তিধর মহানুভব, অস্ত্র ছাড়া আর কি কোন পথ নেই?'

—'নাঃ, কৃতান্তর কাছে নয়। যে ক্ষমতালিপ্সু, লোভের অন্ত নেই তার, ভোগেরও। সহজে তাকে কাবু করতে পারবে না। তবে তোমার সঙ্গে তার পার্থক্য, সে ভোগে ক্লান্ত। তুমি তা নও হয়ত, তোমার এই সংযমই তোমাকে রক্ষা করতে পারে।'

—আপনার একজন পুত্রকে মরতেই হবে, অন্য কোন উপায় নেই?'

—'না, ওই নিষ্ঠুর উন্মাদ আমার এতদিনের তিল তিল করে তৈরি সুন্দর পৃথিবী নষ্ট করবে—'

—'তাই আপনি আমাকে—কিন্তু আমি তো দক্ষিণ দেশের লোক—এখানকার মানুষেরা যাদের অশিক্ষিত বর্বর বলে। আমি কি আপনার সুন্দর পৃথিবী, সসাগরা পৃথিবী তথা অন্তরীক্ষ—'

—'শোন শাশ্বত, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব এবং আমি জানি তুমি বুঝবেই। এখন যে কোন সময়ে কৃতান্ত এসে পড়বে—'

—'কিন্তু এখনও আমি নিরস্ত্র।'

শোকজয়ী কক্ষের একস্থান থেকে অদ্ভুত রকমের কিছু জিনিস নিয়ে এলেন, 'এর মধ্যে থেকে তিনটি অস্ত্র নাও—হ্যাঁ, কৃতান্ত আসবামাত্রই যদি তুমি দূর থেকে এই অস্ত্রটি চালনা করতে পার ঠিকমত, তবে তৎক্ষণাৎ তুমি জয়ী হবে, আর—'

—'কিন্তু সে কোন কিছু বলার আগে, আক্রমণ করার আগে আমি কেন তাকে মারব?'

—'মারবে তোমার নিজের জন্য, দেশের জন্য আর তোমার পিতার জন্য—'

—'পিতার জন্য? কী বলছেন আপনি? কৃতান্ত আপনার প্রিয় পুত্র—'

—'কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে, তুমি নিজেই তো বলেছ, তাছাড়া

আমার মৃত্যুর পূর্বেই সে ক্ষমতা চায়—'

—'তাতে আমার কি করবার আছে ?'

—'সে দুশ্চরিত্র, সে—'

—'চরিত্রহীনতা তো আপনাদের পৃথিবীতে অনুমোদিত—'

—'ওঃ, তোমাকে বোঝাতে পারব না—' একটু থেমে আবার বলেন, 'সে তার পালিকা মাতাকে·· নাঃ, কী করে তোমাকে······'

—'যখন অন্য অনেক নীতিহীনতা অনুমোদিত হতে থাকে, তখনই তো একজন এই পদক্ষেপ নিতে পারে। কত শত নারী যখন ওই কৃতান্ত বা তার অনুচরদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে, অনেকের মৃত্যুও ঘটেছে, আপনি বাধা দেননি। কত মানুষ যখন পিতৃহত্যা, পুত্রহত্যা, পতিহত্যা দেখে কেঁদেছে—আপনি বাধা দেননি। কিছু লোক গেল বা কিছু রমণী কাঁদল তাতে আপনার পৃথিবী সুন্দর করায় কোন বাধা হবে না—এই আপনার ধারণা, দর্শন। তাই কৃতান্ত মনে করে, সে ভুল করতে পারে না—'

বাধা দিয়ে শোকজয়ী বলেন, 'তাহলে তুমি নিজেকে বা আমাকে বাঁচাতে চাও না ?'

—'এই অস্ত্র দিয়ে আপনি তো কৃতান্তকে শেষ করতে পারেন—ভাই ভাইকে যদি হত্যা করতে পারে, তবে পিতা পুত্রকে হত্যা করতে পারবে না কেন ?'

—'এই অস্ত্র চালনা করার ক্ষমতা আমার নেই।' শোকজয়ী মনে মনে ভাবেন, 'ওই বিশ্রী কাজটা আমি করতে চাই না। তোমাকেই করতে হবে শাশ্বত, কারণ তুমি বাঁচতে চাও। কৃতান্তর প্রতি এখন আমি ঈর্ষান্বিত, তাই—কিন্তু এসব তোমাকে বলা যাবে না—' বলে উঠলেন, 'শাশ্বত, বেশি ভাববার সময় নেই। শীঘ্র এই অস্ত্রের ব্যবহার শিখে নাও।' এই বলে অতি দ্রুত তিনি শাশ্বতকে বোঝাতে লাগলেন। যদি প্রথম অস্ত্রে সে বিফল হয়, দ্বিতীয়টি কেমন করে ব্যবহার করতে হবে—সেখানেও যদি সাফল্য না আসে, তবে তৃতীয়টি—হ্যাঁ হ্যাঁ, শোকজয়ী জানেন, দুবারের পরও যদি সাফল্য না আসে, শাশ্বত বেঁচে থাকে, তবে তৃতীয়বারে কৃতান্তের নিষ্কৃতি নেই। আর কৃতান্ত যদি প্রথম বা দ্বিতীয়বারেই সফল হয়, তবে—তবে তখন আর কিছু করবার নেই। ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। মনে মনে তীক্ষ্ণ হাসি হেসে উঠলেন তিনি, আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, সাগর অধিকার, অন্তরীক্ষ অধিকার, কত মারণাস্ত্র, কত সবুজ ফসলে ধরিত্রী পরিপূর্ণ করে তোলার ব্যবস্থা, আরও কত কী আবিষ্কারের পর আজ তাঁকে

ভাগ্যের কথা ভাবতে হচ্ছে! আজও কি তাহলে তিনি সামান্য মানুষ?

প্রচণ্ড শব্দ উঠছে সোপানে। চমকে উঠে শোকজয়ী বললেন, 'শাশ্বত, প্রস্তুত হও। কৃতান্ত আসছে, আমি অন্যত্র চললাম। একদণ্ড পর ফিরে এসে আমি তোমাকে জয়ী দেখতে চাই।'

সমস্ত জায়গাটাই কি বদলে গেল, পটপরিবর্তন হল? কেমন ধূসর লাগছে সব। শাশ্বতর মনে পড়ল তার মায়ের কথা। প্রায় কিছুই না জানিয়ে চলে এসেছে সে। আজ যদি তার বিনাশ হয়, মা কি কোনদিন জানতে পারবে? এরা কি মাকে জানাবে? নাঃ, কখনও নয়। ধূর্ত শক্তিধর শোকজয়ী কখনই জানতে দেবে না শাশ্বতীসুন্দরীকে। দ্বীপ থেকে তটভূমির দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের জল ঝরে ঝরে একদিন হয়ত অন্ধ হয়ে যাবে তার মা! মনে মনে হয়ত চীৎকার করে ডাকবে, শা—শ্ব—ত, কোথায় গেলি বাবা? না না, তাকে ফিরে যেতেই হবে মায়ের কাছে। মা তার তীক্ষ্নধী, হয়ত একদিন সব কিছু বুঝতে পারবে। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়েই কি ভালবাসা, আবেগ, চাওয়া-পাওয়া, মমতা সমস্ত পরিহার করা যায়? নাঃ, বাঁচতে তাকে হবেই। প্রথম ছোট মারণাস্ত্রটি ডান হাতের উত্তরীয়র নিচে শক্ত করে ধরল শাশ্বত। কোন দ্বিধা নেই। কৃতান্তর হাতেও থাকবে অস্ত্র—এখন কে প্রথম ব্যবহার করতে পারে তাই দেখার।

প্রচণ্ড শব্দ। একটু পরে অন্য একটি লৌহদরজা খুলে গেল। স্পর্ধায় কৃতান্তর গলার স্বর অস্বাভাবিক জোর পেয়েছে, 'কোথায়, কোথায় সেই দক্ষিণদেশের মূষিক, যে আমার কাজের প্রতিবাদ করে, কাপুরুষের মত আমারই পিতার গর্তে লুক্কায়িত! বেরিয়ে আয় দক্ষিণদেশের ইঁদুর! তোর প্রাণ এমনিতেও যাবে অমনিতেও যাবে, যদি শীঘ্র সামনে আসিস তবে তোকে যন্ত্রণা কম দেব।' শাশ্বত একটি কৃত্রিম ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে কৃতান্তর অদূরে দাঁড়াল। এইবার শাশ্বত দেরি করল না। মনে মনে বলে, এই অত্যাচারী, অনাচারী ঘৃণ্য পশুকে হত্যা কর—হত্যা কর! শাশ্বত যখন প্রস্তুত, কৃতান্তর অস্ত্রধারী হাত নেমে গেল। কৃতান্ত ভাবে,—এ কে? আমি কি নিজের প্রতিচ্ছায়াকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি? স্ফটিকে আমারই প্রতিবিম্ব? আমাকে ঠকানো হচ্ছে? পিতা কি আমাকে দিয়েই আমাকে হত্যা করতে চায়? কিন্তু না, প্রতিবিম্ব তো নয়। এই যে আমার হাত নেমে গেল কিন্তু ওর হাত তো—অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কৃতান্ত আর এক কৃতান্তের দিকে। শাশ্বতও যেন আর

এক শাশ্বতকে দেখছে। কৃতান্তর স্পর্ধিত উচ্চৈঃস্বরের কণ্ঠবাদন কোথায় হারিয়ে যায়, অস্ফুটে বলে, 'তুমি কে!'

শাশ্বতর চিরকালের নরম মনে কিসের প্রলেপ লাগে, বলে, 'আমি তোমার ভাই।'

—'ভাই? আমার ভাই?' কৃতান্ত বলে।

'কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই।'

—'তুমি কী করে আমার ভাই হবে? আমার পিতা ছাড়া এই স্থল জল অন্তরীক্ষে আর কেউ তো আমার নেই। সত্য বল, তুমি কোনো ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছ আমাকে প্রবঞ্চনা করতে?'

—'আমি প্রবঞ্চনা জানি না, পরীক্ষা কর। আমি সত্যই তোমার ভাই।' শাশ্বত বলে।

কৃতান্ত অস্থির হয়ে ওঠে, 'ভাই—আমার ভাই? জানি না, জানি না সত্যই তুমি আমার ভাই কিনা! কিন্তু আমারই প্রতিবিম্বকে, আমাকেই আমি কেমন করে হত্যা করি? কী নিদারুণ সমস্যা! আমায় সত্য করে বল, তুমি আমার ভাই?'

—'আমার মায়ের নামে শপথ করে বলছি আমি তোমার ভাই।'

—'মা? তোমার মা?' কৃতান্ত বিস্ময়ে কৌতুহলী।

—'তোমারও মা।'

—'আমার মা তোমার মা একই মা? তাহলে আমরা ভাই?'

—'তাই তো বলছি, হ্যাঁ, ভাই।' শাশ্বতর গলা ভিজে আসে, 'ভাই কি ভাইয়ের রক্তপাত করতে পারে? উচিত?'

—'কিন্তু আমার মা—শুনেছি তিনি দুর্বিনীতা, স্বেচ্ছাচারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী—তিনি পিতাকে—'

—'না কৃতান্ত, তিনি তেজস্বিনী, বিচক্ষণা, ন্যায়পরায়ণা, সর্বংসহা ধরিত্রী—যিনি শাশ্বতী প্রকৃতি।'

—'কিন্তু আমি যে শুনেছি তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে আমাকে ত্যাগ করেছিলেন? তাই তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছে?'

—'না, হয়ত তোমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। শুনেছি যখন তোমাকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল, তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। যখন তিনি তোমার সম্পর্কে দাবি জানালেন—তখন তাঁকে নির্বাসিত করা হল।'

—'তিনি নিজে চলে যাননি? তাঁকে—তাহলে—ওঃ, এখন আমাকে নিয়ে আমি কী করব? সত্য বলছ শাশ্বত—সত্য?'

—'সত্য। তুমি পৃথিবীর ভাল করতে চাও, অথচ কিসে ভাল হবে তাই তুমি জান না!'

—'কেন, কেন জানি না?'

—'তুমি জান তোমার পক্ষে যা অপ্রয়োজনীয়, কিংবা যার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সে-ই ধ্বংসযোগ্য। কিন্তু কেন? যারা দুর্বল, আগাছার মত তাদের নিশ্চিহ্ন না করে তাদের সবলও তো করা যায়! এই যে বিশাল কক্ষ—যা কৃত্রিমতায় পূর্ণ, যার ভাবনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কৃত্রিমতা প্রবেশ করানো হয়েছে—এর থেকে বাইরে এস, খোলা আকাশের নিচে, সমুদ্রের ধারে। এস সহজ সরল মানুষের পাশে, এখনও কিছু যারা অবশিষ্ট আছে। দেখবে তোমার নিজেকে নিয়ে অনেক কিছু করবার আছে।'

—'এতদিনের বিশ্বাস, এই বৈভব, এত শত যন্ত্রের কাজ আমার ব্যবহারের জন্য, এই ক্ষমতা—নাঃ, ত্যাগ করা আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। ক্ষমতার স্বাদ যে কত তীব্র এবং মধুর তা তুমি জান না—' হঠাৎ কৃতান্ত লক্ষ্য করল, শাশ্বতর হাতে ক্ষুদ্র অস্ত্র। উত্তরীয় কখন খসে পড়ে গেছে। চীৎকার করে উঠল কৃতান্ত, 'প্রবঞ্চক! কেন এত মিষ্ট কথায় আমাকে ভোলাচ্ছিলে? এ অস্ত্র তুমি কোথায় পেলে? চোর! তঞ্চক!' একটু থেমে বলে, 'কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে ঠিক আমারই আকৃতিতে? তুমি কি কোন যন্ত্রমানব? কে তোমাকে এই পুরীতে পাঠিয়েছে? গুপ্তচর, কতক্ষণ এই কক্ষে তুমি আছ?'

—'বহুক্ষণ, মহানুভব শোকজয়ীর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। তোমার হাত থেকে যাতে আমি বাঁচতে পারি, তাই তিনিই আমাকে এই অস্ত্র দিয়েছেন।'

—'শোকজয়ী পিতা? বিস্ময়! বিস্ময়! তুমি তাঁকে প্রবঞ্চিত করেছ! অনেক ভাই-ভাই খেলা হয়েছে,—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।'

—'বেশ ভাই, আমি প্রস্তুত। হত্যা কর ভাই আমায়—আমার একমাত্র ভাই, আমার সহোদর।'

কৃতান্ত নিক্ষেপ করতে যায়, কিন্তু হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে। চীৎকার করে দুই হাতে মুখ ঢেকে, প্রচণ্ড আবেগে সে কাঁদতে থাকে। বলে, 'অমন করে ভাই বলতে কে তোমাকে শেখালে? তোমাকে মারবার ক্ষমতা হারিয়েছি।

ওঃ একটা শব্দ—একটা স্বর আমার দুর্জয় ক্ষমতাকে পরাস্ত করল! ইচ্ছা করলে শাশ্বত এইবার তুমি আমাকে হত্যা করতে পার। সুন্দর মনে করে যত কুৎসিত কাজ আমি করেছি, তার শাস্তি দিতে পার।'

শাশ্বত তাকিয়ে আছে কৃতান্তর দিকে। বিস্ময়—তারও বিস্ময়! অশ্রুজলে ধৌত এ যেন এক শিশুর মুখ। ক্রন্দনও মানুষকে সুন্দর করে!

ওদিকে শোকজয়ী তাঁর মনোরম ব্যক্তিগত কক্ষে দণ্ডযন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। দণ্ড প্রায় পার হয়ে এল, কই কোন আর্তনাদ বা বিস্ফোরণের শব্দ পেলেন না কেন এখনও? কৃতান্তই তাহলে জয়ী হয়েছে! নিঃশব্দে সে কাজ করে। কিন্তু নাঃ, তাহলে উল্লাসধ্বনি শোনা যেত। তাকালেন একবার ভোগবতীর দিকে। অনেক তর্ক করে ক্লান্ত ভোগবতী আরকের প্রভাবে নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ভোগবতী তর্ক শুরু না করলে ওদের আচরণ কিছু শোনা যেত, বোঝা যেত,—কিন্তু এমন তার্কিক ভোগবতী কি করে হল? নিদ্রিত ভোগবতীর হাত থেকে আস্তে আস্তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন শোকজয়ী।

ভোগবতী স্পষ্টকণ্ঠে বললেন, 'ওদিকে যেও না!'

চমকে উঠলেন শোকজয়ী, 'নিদ্রা যাওনি তুমি?'

—'না, আমি জানি ওদের দুজনকেই তুমি ধ্বংস করতে চাও, কিন্তু তা আমি দেব না। তুমি এখানেই থাক। আমি গোলাপের মধ্যে দিয়ে দেখে আসি।'

—'তুমিও কি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে ভোগবতী?'

—'সে শক্তি আমার নেই। তোমার সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত থাকতে চাই পৃথ্বীশ। প্রিয়—না না, ক্রোধে উত্তেজিত হয়ো না প্রিয়তম। বেশিক্ষণ দাঁড়াবার শক্তি তোমার নেই। তোমার স্নায়ু ঠাণ্ডা করবার আরক আমি তোমাকে দিয়েছি—ভয়ের কী আছে শোকজয়ী ধরণীশ্বর?'

হ্যাঁ পৃথ্বীশের আর এক নাম ধরণীশ্বর। শাশ্বতীসুন্দরী যুবককে তাই বলেছিল, বিশ্রাম কর, আমি ক্ষণকালের মধ্যে ফিরে আসছি।

ভোগবতী সেই কক্ষ ছেড়ে দ্রুত অন্য কক্ষে গেলেন।

এদিকে সেই বিশাল কক্ষে দুই যুবক আলিঙ্গনাবদ্ধ। কৃতান্ত আস্তে—খুব আস্তে, যেন নিজের মনে বলে চলেছে, 'হ্যাঁ মাকে দেখতে চাই—চাই শাশ্বত। কিন্তু কেমন করে তাঁর কাছে যাব? পিতার গুপ্তচরেরা সব সময় আমাকে

অনুসরণ করে—'

—'কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের একবার যেতেই হবে কৃত্রান্ত। আমার জন্যে যে তিনি চিন্তিত এবং আকুল হয়ে পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেন। হয়ত তোমার জন্যও—'

এমন সময় সেই সুন্দর বিরাট গোলাপ তার পাপড়ি খুলতে লাগল, সেই ঘ্রাণ সেই বংশীধ্বনি—দুজনেই চমকে তাকাল সেদিকে। কৃতান্ত বলল, 'ভোগবতী আমার পিতার সহচরী!'

—'উনিই তো তোমাকে মানুষ করেছেন।'

—'হ্যাঁ। পিতা এখানে আছেন মনে করে উনি কিছু বলতে চাইছেন।'

এইবার সেই ফুলের মধ্যে সুন্দর সুঠাম কিন্তু বয়সের ভারে কিঞ্চিৎ স্থূল এক স্ত্রীর ছবি দেখা গেল। শাশ্বত বলল, 'যাও কৃতান্ত, ওঁর সঙ্গে কথা বল। মনে হচ্ছে উনি তোমাকে কিছু বলতে চাইছেন।'

—'না শাশ্বত, আজ দ্বিপ্রহরে যে ব্যবহার আমি ওঁর সঙ্গে করেছি, তারপর এখন কথা বলা অসম্ভব।'

—'কিন্তু বংশীধ্বনি কেঁপে উঠেছে। যাও কৃত্রান্ত—শীঘ্র যাও।'

—'তুমি যাও।'

—'উনি কি আমাদেরও দেখতে পাচ্ছেন?'

—'হয়ত আবছা—কাছে গেলে পাবেন। আমার ওঁর সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা নেই। শাশ্বত তুমি যাও, বলো পিতা এখানে নেই।'

শাশ্বত এগিয়ে যায় ফুলের দিকে। ভোগবতীকে এবার ভাল করে দেখতে পায়। অতীব সুন্দরী যৌবনশেষের রমণী ক্লান্ত, বিস্রস্ত কেশ, চোখের কোণে কালি—যেন অর্ধমৃত। পরিশীলিত মিষ্টকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কৃতান্ত এসেছ? না, লজ্জা পাবার কোনো দরকার নেই। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। হাসছ কি কৃতান্ত? বৎস, লজ্জা ক্ষমা দয়া ভালবাসা এ সমস্ত শব্দ এখানে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সমস্ত শব্দ এবং অনুভবের পুনরুজ্জীবনের বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কৃতান্ত। তোমার দোষ নয় কৃতান্ত, দোষ এই যুগের, এই কৃত্রিম সভ্যতা যারা সৃষ্টি করেছে তাদের। তোমার পিতাও তাদের মধ্যে একজন। তোমার মধ্যে সুন্দর যা কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে তা বোধ হয়……আচ্ছা তোমার ভাই শাশ্বত কি এখনও জীবিত আছে? বলো—'

শাশ্বত যন্ত্রচালিতের মত বলে, 'আছে।'

—'তাহলে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে এই প্রাসাদের—নগরীর বাইরে যত দূরে পার দুজনে চলে যাও। আর এক প্রহরের মধ্যেই এই কৃত্রিম প্রাসাদ ধ্বংস হবে!'

—'কী বলছেন আপনি?'

—'হ্যাঁ, আমি তার ব্যবস্থা করেছি।' হাঁপাচ্ছেন ভোগবতী।

—'কী বলছেন আপনি? এতদিনের পরিশ্রমে তৈরী এত আধুনিক অগ্রসর কৌশলযুক্ত প্রাসাদ ধ্বংস হবে?'

চমকে উঠে বললেন ভোগবতী, 'তু—মি কে? তুমি তো কৃতান্ত নও! তাহলে কি কৃতান্ত নিহত?' অবসাদের মধ্যেও তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হল, চোখ বাষ্পাকুল।

শাশ্বত বলল, 'না মাতা, আমরা দুজনেই জীবিত। আমি শাশ্বত।'

'শাশ্বত, শাশ্বত!' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলেন ভোগবতী, 'কৃতান্ত কোনদিন আমাকে 'মাতা' বলে ডাকেনি। নাম ধরে ডাকত, তাকে অগ্রগতির নামে তাই শেখানো হয়েছিল। মা—তা! বড় সুন্দর সম্বোধন পুত্র! তাকে বলো, আমি তাকে শিশুকাল থেকে বড় করেছি। আমি তার মাতা। আমার সম্পর্কে সে যেন এখন থেকে তাই ভাবতে শেখে। কিন্তু আর সময় নেই। আকাশযান বা চক্রযান বা অনেক রকমের আধুনিক যান এখানে আছে। যে কোনো যান নিয়ে তোমরা দক্ষিণে পালাও—তারপর বেঁচে থেকে যদি পার দুই ভ্রাতা একসঙ্গে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলো। সেই পৃথিবীর মানুষেরা—পুরুষ এবং রমণী যেন প্রতি মুহূর্তে ভাল করে বাঁচতে শেখে। ভয় পেয়ে পেয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর না হয়।'

আরও কী যেন বলতে বলতে ভোগবতী মিলিয়ে গেলেন। গোলাপ যেন একটা ছোট্ট কুঁড়ি।

কৃতান্ত দ্রুত শাশ্বতর কাছে এল। তার ব্যগ্র চোখেমুখে একটা মস্ত বড় জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। শাশ্বত অতি দ্রুত সব সংবাদ বলল। তারপর তারা ছুটে চলল বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। প্রহরীরা অবাক হবার পূর্বেই কৃতান্ত কী এক ধরণের চারটি চাকা শাশ্বতর পায়ে পরিয়ে দিল। তার বাহুর নীচে কি লাগাল, নিজেও পরে নিল তাই। দুজনে ছুটে চলল কিম্বা উড়ে চলল দক্ষিণমুখী। নগরীর সীমান্তে অতি প্রত্যুষে এই দুই যুবককে এইভাবে যেতে দেখে প্রাতঃভ্রমণকারীরা অবাক হল, ভাবল, কৃতান্তর ভয়ে যুবকেরা কি নগরী

ত্যাগ করছে ?

যখন তারা যোজন-দূরে চলে গেছে, প্রায় বন্দরের কাছাকাছি—এক বিস্ফোরণের শব্দ তারা শুনতে পেল। উত্তরে তাকিয়ে কৃতান্ত যন্ত্রের দ্বারা দেখল—আকাশ ধূম্রজালে আচ্ছন্ন।

আরও দূরে দক্ষিণ সমুদ্রের এক দ্বীপ থেকে শাশ্বতী ধরিত্রীও টের পেলেন এক মৃদু ভূকম্পন! অটভূমি যেদিকে, সেদিকে অজান্তেই তাকালেন তিনি।